ভাল লাগার নেশা

ভাল লাগার নেশা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়
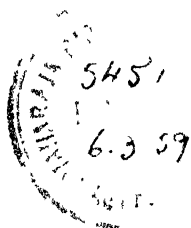
কথামালা প্রকাশনী
১৮এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলকাতা-১২

শ্রীপূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়

পরম প্রীতিভাজনেষু

লেখকের অন্যান্য বই

কয়লাকুঠির দেশ

ঠিক-ঠিকানা

শৈলজানন্দের শ্রেষ্ঠ গল্প

শৈলজানন্দের স্বনির্ব্বাচিত গল্প

বধূবরণ

অপরূপা

বন্ধুপ্রিয়া

আজ শুভদিন

কমল-মণি

ভূতুড়ে বই

অসম্ভব

আমার মা

ছোটদের গল্পসঞ্চয়ন

ডাক্তার

বন্দী (নাটক)

শহর থেকে দূরে

মানে-না-মানা

অভিনয় নয়

শৈলজানন্দের গ্রন্থাবলী

এই সঙ্কলনের ভাল-মন্দ দায়িত্ব বন্ধুবর বীরেশ্বর বসুর। অনেকগুলি অপ্রকাশিত লেখা থেকে তাঁর যা ভাল লেগেছে, তাই তিনি বেছে নিয়েছেন। বীরেশ্বরবাবু নিজে একজন সাহিত্যসেবী, কাজেই তাঁর ভাল লাগার মূল্য আমাকে দিতেই হবে।

কিন্তু সবার উপরে আমার পাঠক পাঠিকা। তাঁদের ভাল লাগা আমাদের দু'জনেরই কাম্য।

শৈলজানন্দ

সূচী

লু কো চু রি

রেলের স্টেশনে তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

ছোট্ট স্টেশন। মিট্ মিট্ করে দু'একটি আলো জ্বলছে। ট্রেণ আসতে আধঘণ্টা দেরি। বাইরে অন্ধকারে একটা বেঞ্চি পড়েছিল। তাইতে গিয়ে বসলাম। পা ছড়িয়ে যে একটু শুয়ে পড়বো তার উপায় নেই। মনে হলো বেঞ্চির অপর প্রান্তে কে যেন আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে বসে আছে।

আধ ঘণ্টা কেমন করে কাটাবো তাই ভাবছি। হঠাৎ কে যেন আমার গায়ে মারলে এক ঠেলা। আচম্‌কা চম্‌কে উঠলাম—কে?

জবাব পেলাম না। সেইদিকে তাকিয়ে আছি। দেখলাম, পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে' ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, দেশলাই আছে?

দিলাম দেশলাই। বিড়িটা ধরিয়ে দেশলাইটা তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কোত্থেকে আসছেন আপনি?

বললাম, কুড়মুন থেকে।

—কোথায় যাওয়া হবে?

—পাঁচুই।

—এখানে কি জন্যে এসেছিলেন?

বললাম, মেয়ের জন্যে একটি পাত্রের সন্ধানে বেরিয়েছি মশাই। ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক অন্ধকারেই আমার দিকে একটু সরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, বিড়ি খাবেন?

—আজ্ঞে না। বিড়ি আমি খাই না।

—হুঁ। বলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন তিনি। তারপর বললেন, এই লাইনে আপনি অনেকদিন ধরে' ঘুরছেন?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ঘুরছি। কিন্তু মনের মত ছেলে একটি কোথাও পাচ্ছি না।

জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে কেমন ?

বললাম, সুন্দরী।

ভদ্রলোক যেন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, সুন্দরী ? খুব সুন্দরী ? টানাটানা চোখ, বড় বড় চুল, গায়ের রং খুব ফর্সা, ছিপ্‌ছিপে ছিপছিপে ডুহারা গড়ন ? তা যদি হয় মশাই তো আমি বলি কি বিয়ে দেবেন না।

ভাল। উপদেশটি মন্দ নয়। তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কেন বলুন দেখি ?

কোনও জবাব পেলাম না। অন্ধকারে শুধু তাঁর বিড়ির আগুনটা টিপ্‌ টিপ্‌ করে জ্বলতে লাগলো।

খানিক পরে বিড়িটা তিনি ফেলে দিলেন ছুঁড়ে। তারপর বললেন, কেন, জিজ্ঞাসা করছেন ? আমি বলি কি—বিয়ে তার নাই-বা দিলেন ! বিয়ে দিয়েছেন কি বাস্‌, দেখবেন, মেয়ে আপনার হারিয়ে গেছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আর তাকে খুঁজে পাবেন না।

লোকটা পাগল নাকি ? সন্দেহ হলো। অন্ধকারে পাশাপাশি বসে আছি। ভয় হলো। উঠে দাঁড়ালাম। কাজ কি বাবা, পাগল যদি সত্যিই হয় তো দূরে সরে যাওয়াই ভালো। বললাম, ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। টিকিট কিনি।

তিনিও উঠে দাঁড়ালেন। টপ্‌ করে আমার একখানা হাত ধরে ফেললেন।

পাগল না হয়ে যায় না ! হাতখানা ছাড়িয়ে নিলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট দেবার জানলাটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি আমার পিছু-পিছু এলেন।

বললাম, পাঁচুইএর একখানা টিকিট দেবেন স্যার ?

স্টেশনমাষ্টার একখানা বই পড়ছিলেন। আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, ট্রেণ আসতে দেরি হবে মশাই, বারিদপুরে একটা এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে গেছে।

আমার পাশের ভদ্রলোক চেঁচিয়ে উঠলেন,—কি বললেন ? এ্যাক্সিডেণ্ট ? চলন্ত ট্রেণ থেকে কেউ পড়ে গেছে নিশ্চয়ই।

স্টেশনমাষ্টার বলে উঠলেন, এই যে মুখুজ্যেমশাই ! কি খবর ? আজ আর বাড়ী যাননি বুঝি ?

লোকটি তাহ'লে মুখুজ্যেমশাই। স্টেশনমাষ্টারের পরিচিত। খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, কই আর গেলাম। বলেই তিনি আমার একখানা হাত ধরে আবার টানাটানি শুরু করলেন। বললেন, আসুন, ট্রেণের এখনো দেরি আছে। বসে একটু গল্প করি আসুন।

আমি ইতস্ততঃ করছিলাম। মুখুজ্যেমশাই বললেন, পাগল ভাবছেন? পাগল আমি নই। বি-এ পাশ করে' স্কুল-মাষ্টারী করতাম। আমি গ্র্যাজুয়েট।

—ভাল। বলুন কি বলবেন।

—না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। আসুন ভাল করে চেপে বসি।

যেতে হলো তার সঙ্গে। বসতেও হলো। ভরসা স্টেশনমাষ্টার। বেগতিক দেখি তো তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করবো।

মুখুজ্যেমশাইএর প্রথম কথা: সুন্দরী মেয়ে আপনি কতগুলি দেখেছেন বলুন।

বড় কঠিন প্রশ্ন। বললাম, তা হ্যাঁ দেখেছি দু'-চারজন। কতগুলি দেখেছি তা আর কেমন করে' বলবো।

তিনি বললেন, না। আমার কথার জবাব আপনি দিতে পারলেন না। সুন্দরী যদি সত্যিকার সুন্দরী হয় তো মনে ঠিক থাকবেই। ছবিখানা যার মন থেকে মুছে যাবে, জানবেন সে সুন্দরী নয়।

বললাম, তা সেরকম সুন্দরী, মানে চিরদিন মনে রাখার মত সুন্দরী দেখেছি কি না—কি জানি মশাই, মনে পড়ছে না।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, এই লাইনে অনেকদিন ধরে' যাওয়া-আসা করছেন বললেন, অথচ সুন্দরী দেখেন নি? কোন্ ক্লাসে চড়েন?

বললাম, থার্ড ক্লাস।

তিনি বললেন, তাহলে দেখেছেন। দক্ষিণদিকের একটি জানলার পাশে—কালো, মিশমিশে কালো, মিশমিশে কালো একমাথা চুল—কপালে ছোট্ট একটি টিপ, ঢলঢলে দুটি চোখ, চঞ্চল দুটি চোখের তারা, মনে হয় যেন সব সময় থর্ থর্ করে' কাঁপছে, ঠোঁট দুটি লাল, মুক্তোর মত দাঁত, নিটোল দুটি হাত, গায়ের রং ঠিক যেন দুধে-আলতায় গোলা, আলতাপরা দুটি পা, লাল-পাড় শাড়ী পরেছিল—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি থামলেন। তারপর আবার বললেন, নাঃ, বর্ণনা করে' তাকে ঠিক বোঝানো যাবে না। সে রূপ, সে যৌবন, ওই যে বললাম, একবার দেখেছেন কি, চিরদিনের জন্য আপনার মনের মণিকোঠায় গাঁথা হয়ে থাকবে। যে দেখবে তার বুকের ভেতরটা থর্ থর্ করে' কাঁপতে থাকবে। যখনই চোখ বুজে তাকে স্মরণ করবেন, আপনার ইষ্টদেবতার মত তার ছবি

চোখের সামনে জল্ জল্ করে জ্বলে উঠবে। আচ্ছা ধরুন, সেই অপরূপ সুন্দরী আমার স্ত্রী। কি বলবেন তাকে? সুখী, না দুঃখী?

স্টেশনের আলোয় মুখুজ্যেমশাইকে আমি দেখেছি। সুন্দর সুপুরুষ বলা চলে না, বরং ঠিক তার বিপরীত।

চুপ করে' ছিলাম। তিনি বললেন, থাক্ আর বলতে হবে না। বুঝেছি। আমার মত স্বামী পেয়ে সুখী সে হতে পারে না। আচ্ছা তা না হোক্, আপনি বলুন তাকে এই ট্রেণে কোনদিন দেখেছেন কি না।

বললাম, না মশাই, দেখিনি।

ভদ্রলোক হাতখানা আমার চেপে ধরলেন। বললেন, কেন মিছে আমাকে ভোগাচ্ছেন মশাই, বলুন না কোথায় দেখেছেন!

—সত্যি বলছি আপনি বিশ্বাস করুন, আমি দেখিনি। আর দেখলেই বা আমি তাকে চিনবো কেমন ক'রে?

ম্লান একটু হাসলেন তিনি। বললেন, ওই তো বললাম—তাকে চিনতে হয় না। একবার—একটিবার শুধু চোখে চোখে দেখা। বাস, চিরদিনের মত চেনা হয়ে যাবে। বলুন—কোথায় দেখেছেন বলুন। আপনি যখনই বলেছেন দেখেননি, তখনই আমি বুঝতে পেরেছি আপনি দেখেছেন। জানালার ধারে চুপটি করে' বসেছিল, না?

না, লোকটি সত্যিই পাগল।

—বলুন মশাই বলুন। চুপ করে' থাকবেন না। শোনবার জন্যে আমি ছট্‌ফট্ করছি।

—সত্যি বলছি আমি দেখিনি। আমাকে ক্ষমা করুন।

—নিশ্চয় দেখেছেন। আমি জানি, এই লাইনের ট্রেণে ট্রেণে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। বলুন নইলে আমি আপনাকে ছাড়বো না। এই বলে তিনি আমার হাতখানা আবার একবার সজোরে চেপে ধরলেন।

বললাম, এ কি করছেন আপনি? বিশ্বাস করুন।

মুখুজ্যেমশাই হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, বিশ্বাস! কাকে বিশ্বাস করব? মানুষকে? মরবার দিন পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে পারে। এইটিই মানুষের বিশেষত্ব। আপনিও মিথ্যা বলছেন।

—আজ্ঞে না, আমি মিথ্যা বলিনি।

—নিশ্চয় বলছেন।

বেশ বিপদে পড়লাম। এখন এই ভদ্রলোকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলে বাঁচি! পাগল তো অনেক দেখেছি, কিন্তু এরকম পাগল তো কখনও দেখিনি। বললাম, বসুন আপনি। আমি আসছি। টিকিট কিনে আনি। পালাবো না।

বলেই উঠে পড়লাম সেখান থেকে। ভদ্রলোক বোধ হয় বিশ্বাস করলেন। বললেন, আসুন, আমি ততক্ষণ একটা বিড়ি খেয়ে নিই।

ঢুকলাম গিয়ে স্টেশনে। স্টেশনমাষ্টার বই পড়ছিলেন। মুখ তুলে বললেন, কি চাই?

বললাম, বাঁচান মশাই আপনাদের এই মুখুজ্যের হাত থেকে। গাড়ী না আসা পর্যন্ত আমাকে একটুখানি আশ্রয় দিন এইখানে।

হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, দোরটা বন্ধ করুন।

দোর বন্ধ করলাম।

মাষ্টারমশাই বললেন, বসুন ওই চেয়ারে।

বসলাম।

বললেন, আপনি বুঝি বলেছেন দেখেননি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। দেখেছি কেমন করে' বলবো বলুন!

তিনি বললেন, দেখেছি বললে নিস্তার পেতেন। ভদ্রলোক ভাবতেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। এর কারণ অবশ্য একটা আছে।

কারণটা জানবার ইচ্ছা হলো। জিজ্ঞাসা করলাম, কি ব্যাপার বলুন তো স্যার।

শুনুন। বলে তিনি আরম্ভ করলেন মুখুজ্যেমশাই-এর গল্প।

ট্রেণ এলো দু'ঘণ্টা দেরি করে'। গল্প তখন শেষ হয়ে গেছে।

মুখুজ্যেমশাই-এর গল্পটি কিন্তু এখনও ভুলিনি।

সে গল্প আজ আপনারাও শুনুন।

এখান থেকে মাইল-খানেক দূরে যে গ্রাম, সেই গ্রামে মুখুজ্যের বাড়ী। বাড়ীতে তাঁর বাবা মা স্ত্রী পুত্র কিছুরই অভাব নেই। পশ্চিমে কোথায় কোন্ একটা সাহেবের ইস্কুলে মাস্টারি করেন। ছুটি পেলে বাড়ী আসেন।

পরমানন্দে দিন কাটছিল। হঠাৎ একদিন তাঁর স্ত্রী গেল মরে।

মরবার সময় স্ত্রীকে তিনি দেখতে পেলেন না।

টেলিগ্রাম পেয়ে বাড়ী এলেন। সব তখন শেষ হয়ে গেছে। একটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। কেঁদে সারা হলো বাবাকে দেখে। মুখুজ্যেমশাইও কাঁদলেন।

ছোট ছেলেটির মুখের পানে তাকানো যায় না। শুধু বলে, মা কখন আসবে বাবা?

তাকে তিনি সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, মা তোমার আসবে বাবা। শীগ্‌গির তোমার মাকে নিয়ে আসবো। নতুন মা।

নতুন মাকে দেখবার জন্যে ছেলে তাঁর ব্যাকুল হয়েছিল কিনা জানি না। কিন্তু মুখুজ্যেমশাই নিজে মনে হলো যেন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

আর হবে নাই বা কেন?

মা বাবা দু'জনেই বেঁচে, অবস্থা ভাল, তার ওপর বয়স মাত্র চল্লিশ। চুলও পাকেনি, দাঁতও ভাঙেনি।

মুখুজ্যেমশাইএর বুড়ো বাপের উৎসাহই যেন সবচেয়ে বেশি। তিনজন ঘটক ঠিক করলেন। একমাস সময় দিলেন তাদের। বললেন, গরীবের মেয়ে অনেক আছে আমাদের দেশে—পয়সা অভাবে যাদের বিয়ে হচ্ছে না। তেমনি একটি মেয়ে সবার আগে যে এনে দিতে পারবে তাকে আমি বখশীস দেবো একশ' টাকা।

মেয়ে পাওয়া গেল একমাসের আগেই। হাতের কাছেই ছিল—ক্রোশ পাঁচেক দূরে। বাসুদেবপুরের তিনকড়ি চাটুজ্যের মেয়েটির তখনও বিয়ে হয়নি। পরমাসুন্দরী মেয়ে। বাপ নিতান্ত গরীব। ভেবেছিল মেয়ের রূপ আছে। বিয়ে তার এমনিতেই হয়ে যাবে। কিন্তু টাকা ছাড়া কেউ যখন তাকে বিয়ে করতে চাইলে না, তখন বুড়ো বাপ হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিল।

ঘটক গিয়ে তাকে ধরে বসলো। তিনকড়ি চাটুজ্যে রাজি হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। বললে, চল্লিশ বছর বয়েস আর তেমন বেশি কি বাবা! মেয়ে আমার দুবেলা খেতে পাবে, পরতে পাবে—এই যথেষ্ট।

তাই হলো। টেলিগ্রাম পেয়ে মুখুজ্যেমশাই এলেন পশ্চিম থেকে। ইস্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এলেন একমাসের।

মুখুজ্যেমশাইএর বড় মেয়েটি তখন বারো পেরিয়ে তেরোয় পড়েছে। নাম পাঁচি।

পাঁচি শুনলে বাবা তার আবার বিয়ে করবে। বললে, হাঁ বাবা শুনছি নাকি তুমি আবার বিয়ে করবে?

মুখুজ্যেমশাই বললেন, হ্যাঁ মা, তোমার মা ঘর-সংসার যে আঁধার করে দিয়ে গেল মা।

এই বলে খানিক চুপ করে থেকে আবার বললেন, এবার তোমার নতুন মা আসবে। দেখবে তোমাদের কত ভালবাসবে।

পাঁচি বললে, হ্যাঁ, তোমার যেমন কথা! সৎমা ভালবাসবে! তাই আবার বাসে কখনও!

মুখুজ্যেমশাই বললেন, ছি, ও-কথা বলতে নেই।

—না বলতে নেই! পাঁচি বললে, সৎমার মুখে আমি ঝাঁটা মারবো।

বলেই সে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

মুখুজ্যেমশাই হাসলেন। মনে মনে বললেন, ছেলেমানুষ!

যাই হোক্, বিয়ে চুকে গেল।

শ্রীমতী ছায়ার সঙ্গে মুখুজ্যেমশাইয়ের।

কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেয়ে ছায়ার বুড়ো বাপ কাঁদতে লাগলো আনন্দে। ছায়া কাঁদতে লাগলো—আনন্দে কি দুঃখে কিছু বোঝা গেল না।

হাসলেন আমাদের মুখুজ্যেমশাই। হাসতে হাসতে ছায়াকে নিয়ে বাড়ী ফিরলেন।

ছায়াকে দেখে অবাক হয়ে গেল গ্রামের লোক।

অবাক্ হলো না শুধু পাচি। মুখুজ্যেমশাইএর কন্যা পাঁচি।

পাঁচি তার নতুন মাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সুযোগ খুঁজছিল। বাবা তার চোখের আড়াল হতেই কাপড় ঢাকা দিয়ে একটা থালা এনে নামিয়ে দিলে নববধূর চোখের সামনে। বললে, খাও!

দেখা গেল থালা-ভর্ত্তি যে-বস্তুটি সে নামিয়ে দিয়ে গেল সেটি নেভানো উনোনের ছাই!

ছায়া দেখলে তাকিয়ে। কোনো কথা বললে না। যেমন বসেছিল কাঠ হয়ে তেমনি বসেই রইলো।

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল পাঁচি! হঠাৎ এক সময় সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো। বললে, খাও!

মানুষের হাসিও যে মানুষকে কাঁদিয়ে ফেলতে পারে ছায়ার তা জানা ছিল না। পাঁচির হাসির আওয়াজ ধক্ করে' বাজলো গিয়ে ছায়ার বুকে। ছায়ার দুচোখ বেয়ে দর দর ক'রে' জল গড়িয়ে এলো।

রাত্রে মুখুজ্যেমশাইএর সঙ্গে দেখা। মুখ ভারি করে' বসেছিল ছায়া। মুখুজ্যেমশাই বললেন, এত সুন্দর মুখে হাসি না থাকলে মানায় না।

বলেই ছায়ার মুখখানি তিনি হাত দিয়ে তুলে ধরলেন।

ছায়া তাঁর হাতখানা সরিয়ে দিলে।

মুখুজ্যেমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি এখানে ভাল লাগছে না ছায়া?

ছায়া বললে, না।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, চল তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যাই আমি যেখানে মাস্টারি করি সেইখানে। জল হাওয়া ভাল—চমৎকার জায়গা—তোমার খুব ভাল লাগবে।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। মুখুজ্যেমশাই নিয়ে গেলেন তাকে তাঁর চাকরির জায়গায়।

ইস্কুলের কাছেই দোতলা একখানি বাড়ী ভাড়া নিলেন মুখুজ্যেমশাই। ছায়াকে বললেন, এবার মনের মত ক'রে সাজাও তোমার সংসার।

মুখুজ্যে মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, রাঁধুনী রাখবো?

ছায়া বললে, না। আমি গরীবের মেয়ে। রাঁধতে জানি।

মুখুজ্যেমশাই আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। ইস্কুলের চাকরি, কতই-বা মাইনে! এই রকম স্ত্রীই তিনি চেয়েছিলেন।

কিন্তু এত বড বাড়ী—ছায়া একা। বোধহয় তার কষ্ট হয়—এই ভেবে মুখুজ্যেমশাই একদিন ইস্কুলে গিয়ে তাঁর এক বাঙ্গালী ছাত্রকে ডেকে বললেন, হাঁরে, চণ্ডী, তোদের বাড়ীতে কে কে আছে?

চণ্ডী বললে, আমার মা আছে, দিদিরা আছে—

মুখুজ্যেমশাই বললেন, তোর দিদিদের পাঠিয়ে দিস দেখি আমার বাড়ীতে।

বলে বোধহয় তিনি ভাল করলেন না। চণ্ডীর দুই দিদি একদিন এলো মাষ্টারমশাইএর বাড়ী। ছায়ার চোখ-ঝলসানো রূপ বোধহয় তাদের পছন্দ

হলো না। বাড়ী ফিরে গিয়ে রটিয়ে দিলে—মাষ্টারমশাইএর বৌ দিনের বেলাও ভূতের ভয়ে ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাকে।

আর একটি মেয়ে বললে, না না, ভূতের ভয়ে নয়। মেয়েটা মাস্টারমশাই-এর বিয়ে-করা বৌ নয়। কোন্ রাজরাজড়ার বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। তাই পুলিশের ভয়ে ঘরে খিল বন্ধ করে বসে থাকে।

এই কথাটাই রটে গেল চারিদিকে। সঙ্গে সঙ্গে এও রটলো—মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী।

ইস্কুলের ছেলেরা সুযোগ পেলেই গিয়ে হাজির হয় মাষ্টারমশাইএর বাড়ীর দরজায়। কেউ-কেউ বা সোজা দোতলায় উঠে চলে যায়, কেউ-বা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

ছায়া ভারি বিপদে পড়লো। বার বার নীচে গিয়ে দোর খুলে দিতে হয়। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ছেলেগুলো তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এমন সব কথা জিজ্ঞাসা করে যার জবাব দেওয়া যায় না।

ছায়া একদিন বললে মুখুজ্যেমশাইকে—এ কি করেছ তুমি? বারণ করে দিও ছেলেদের। তারা যেন আর না আসে।

মুখুজ্যেমশাই সেদিন স্কুলে গিয়ে ছেলেদের তিরস্কার করলেন। বললেন, খবরদার তোমরা কেউ যেয়ো না আমার বাড়ীতে।

ফল হ'লো বিপরীত।

ছেলেরা আরও বেশি করে' ঝুঁকে পড়লো। দুষ্ট ছেলের অভাব নেই। বাড়ীতে ঢুকতে না পেয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে দু একটা ছেলে গিয়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করলে।

মুখুজ্যেমশাই বিব্রত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, এখানে থাকা তাঁর চলবে না। ইস্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবেন।

এমন দিনে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

একদিন দুপুরে মাষ্টারমশাই খেয়ে দেয়ে ইস্কুলে চলে গেছেন. কুড়ি একুশ বছরের একটি ছেলে মাষ্টারমশাইএর দোরে এসে দাঁড়ালো। ছেলেটি শুনেছে মাষ্টারমশাইএর স্ত্রী নাকি অপরূপ সুন্দরী, শুনেছে সে কোন্ রাজার মেয়ে—লুকিয়ে পালিয়ে এসেছে এইখানে। ভারি ইচ্ছে হয়েছে তাকে দেখবার। কিন্তু সুযোগ কোনদিনই পায়নি।

সেদিন দেখলে দরজা খোলা। নীচের কলতলায় ঝি বাসন মাজছে। ছেলেটি সোজা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

ছায়া শুয়েছিল চুপটি করে। ছেলেটিকে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসলো। বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞাসা করলে, কে তুমি? কেন এসেছ?

ছেলেটি বললে, এক গ্লাস জল খাব। দেবেন?

—জল খাবার আর জায়গা পেলে না?

ছায়া উঠলো। জল চাইলে আর কেমন করে না দেয়! কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে ছায়া তার হাতের কাছে নামিয়ে দিলে। কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো তার। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে রেলিংএর ওপর ঝুঁকে পড়ে ছায়া ডাকলে, মতিয়া!

মতিয়া ঝির নাম। মতিয়া কলতলা থেকে সাড়া দিলে: কি!

—কাজ করছো?

—জি, হাঁ।

—যাবার সময় আমাকে ডেকো। দোর বন্ধ করব।

ছায়া তবু খানিকটা আশ্বস্ত হলো।

ফিরে এসে দেখে, জলের গ্লাসটি হাত দিয়ে ধরে ছেলেটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

ছায়া বললে, খাও। জল খাও। চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

ছেলেটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো ছায়ার মুখের দিকে। জলও খেলে না, কোনও কথাও বললে না।

কি ব্যাপার? পাগল নাকি?

ছায়াকে দেখা তার যেন শেষই হয় না! ছায়া জিজ্ঞাসা করলে, কি দেখছো অমন করে?

জবাব দিতে গিয়ে ছেলেটির চোখ দুটি জলে ভরে এলো। টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

তারপর কি তার মনে হলো কে জানে। ঢক্ ঢক্ করে' গ্লাসের জলটা খেয়ে ফেলে ঠক্ করে' গ্লাসটি নামিয়ে রেখে সে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

ছায়া তার পিছু পিছু বেরিয়ে এলো বারান্দায়। সিঁড়ি দিয়ে তর তর ছেলেটি নেমে গেল। একবার ফিরেও তাকালে না।

ছায়া কাঠের মত রেলিং ধরে চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইলো। কিছুই সে

বুঝতে পারলে না। ছেলেটি এলোই বা কেন, জল খেয়ে এমন কাঁদতে কাঁদতে পালিয়েই-বা গেল কেন কে জানে ?

কথাটা সে কাউকে বললে না। মুখুজ্যেমশাইকে বলবো বলবো করেও বলতে পারলে না। ছায়ার ভালোই লাগলো ছেলেটিকে। মুখখানি বেশ। দেখলে মায়া হয়। ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

সে আর আসে না।

ছায়া একদিন জানলার ধারে চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, হঠাৎ তার নজরে পড়লো সেই ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে একটা গাছের তলায়। মুখ তুলে তাকাতেই চোখোচোখি হয়ে গেল।

ছায়া ডাকলে। বললে, শোনো!

ছেলেটি কেমন যেন ভয়ে ভয়ে ওপরে উঠে এলো।

ছায়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলে, তোমাম নাম কি ?

ছেলেটি বললে, যতীন।

ছায়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে' বসলো : সেদিন আমার মুখের দিকে ওরকম-ভাবে তাকিয়েছিলে কেন বলতো? তোমাকে দেখে আমার কেমন যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

এতক্ষণ পরে ছেলেটি কথা বললে।—মনে হচ্ছে ?

বলেই সে তার পকেট থেকে একটি ভাঁজ করা কাগজ বের করলে। কাগজটি ছায়ার হাতে দিয়ে বললে, পড়ে দেখবেন। ভেবেছিলাম এইটি আজ আপনার হাতে দিয়ে পালিয়ে যাব।

ছায়া বললে, না যেয়ো না। দাঁড়াও।

ছায়া মনে মনে লেখাটা পড়লে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

ছেলেটি লিখেছে—

আপনার কাছে আমি প্রথম যেদিন এসেছিলাম, আজ আমি অকপটে স্বীকার করছি খুব ভাল মন নিয়ে আসিনি। কিন্তু আপনাকে দেখেই আপনার মুখের দিকে তাকিয়েই আমার যে কি হয়েছে তা জানি একমাত্র আমি আর জানেন আমার অন্তর্যামী। আমার একটি বোন ছিল। আমার চেয়ে এক বছরের ছোট। ভারি ভালবাসতাম আমি তাকে। সে আমাকে একদণ্ড না দেখে থাকতে পারতো না। সে বোন আমার চলে গেছে। মরে গেছে গত মাঘ মাসে। পৃথিবীর দুজন মানুষের চেহারা যে এরকম এক

হতে পারে, সে বিশ্বাস আমার ছিল না। আমি চমকে উঠেছিলাম সেদিন আপনাকে দেখেই। মনে হয়েছিল আমার বোন শীলা যেন আবার ফিরে এলো। এখনো আমার সে সন্দেহ ঘোচেনি। আমি জানি—একথা সত্য নয়, আপনি আমার বোন নন, শীলাকে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে শ্মশানে পুড়িয়ে এসেছি।—আর আমি লিখতে পারছি না। আমার চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে আসছে। ইতি—যতীন।

চিঠিখানা পড়ে ছায়া মুখ তুলে চাইলে। দেখলে, যতীনের চোখদুটি জলে ভরা। সে কাঁদছে।

ছায়া বললে, কেঁদো না। এসো। বোসো এইখানে।

খাটের পাশে একটি মোড়ার ওপর যতীন বসলো। বললে, আপনি কি মাস্টারমশাইকে আমার কথা জানিয়ে দেবেন?

—জানাতে বারণ যদি কর তো জানাবো না।

যতীন হাত জোড় করে' বললে, দোহাই আপনার। বলবেন না।

ছায়া বললে, বেশ, বলবো না।

তারপর সে জানতে চাইলে বাড়ীতে তার কে কে আছে?

যতীন বললে, বাবা আছে আর ছোট একটি ভাই আছে। শীলা তো—

শীলার কথা বলতে গিয়ে আবার সে কেঁদে ফেললে।

ছায়া বললে, বেশ তো, মনে কর আমি তোমার সেই বোন।

যতীন মুখ তুলে আবার তাকালে ছায়ার দিকে। তারপর মুখ নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, আজ চললাম। এই কথা আমাকে ভাবতে দিন। আর আমি কিছু চাই না।

যতীনই স্কুল থেকে পালিয়ে এলো সেদিন। এসেই বললে, শীলা আমি এসেছি।

—আপনাকে আমি শীলা ব'লে ডাকবো?

ছায়া বললে, বলেছি তো সেদিন। আমি তোমার সেই বোন। তুমি আমার দাদা।

যতীন বললে, সত্যি বলছেন?

ছায়া বললে, আপনি বলছো কেন, তুমি বল।

আনন্দে যতীন যেন আত্মহারা হয়ে গেল। বললে, আমি যদি রোজ আসি, কিছু বলবে না তো?

—না কিছু বলবো না।

যতীন আজকাল রোজই আসে। ছায়াকে বলে, শীলা। ছায়া বলে, দাদা। ঠিক যেন দুটি ভাই বোন!

শীলা বলে, রোজ তুমি ইস্কুল থেকে পালিয়ে আসো, পড়ার ক্ষতি করলে কিন্তু বলে দেবো তোমাদের মাষ্টারমশাইকে।

যতীন বলে, ইস্কুল থেকে পালিয়ে আসি কিন্তু পড়ার ক্ষতি আমার হয় না। ইস্কুলের ছুটির পর এলে মাষ্টারমশাই দেখতে পাবেন।

তাও সত্যি। মাষ্টারমশাইকে ছায়া যতীনের কথা কিছু বলেনি। বললে তিনি সহ্য করবেন বলে মনে হয় না। যতীন নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়।

ছায়ার ভাই ছিল না, ভাই পেয়েছে। যতীনকে মন্দ লাগে না।

মুখুজ্যেমশাই আজকাল খুব সৌখীন হয়ে উঠেছেন। প্রত্যহ সাবান মাখেন, রুমালে সেণ্ট ব্যবহার করেন, রঙীন জামা গায়ে দেন।

ইস্কুলের অন্যান্য শিক্ষকেরা বলেন, মুখুজ্যেমশাই আজকাল দেখছি সুপার-ফাইন্ ধুতি পরছেন!

কথাটা মুখুজ্যেমশাই হেসে উড়িয়ে দেন।

দেশে যাওয়া তিনি একরকম পরিত্যাগ করেছেন। সেখানে যে তাঁর ছেলেমেয়ে আছে সেকথা বোধ হয় তিনি ভুলেই গেছেন।

ইস্কুলে সেদিন তখন টিফিনের ঘণ্টা পড়েছে। টিচারেরা বসেছেন হলঘরের একপাশে। এই সময় তাঁরা রোজই এইখানে এসে বসেন। মুখুজ্যেমশাই বসেছিলেন জানলার পাশটিতে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পরিমলবাবু এসে দাঁড়ালেন তাঁর কাছে। বললেন, কই, একটা বিড়ি দিন দেখি!

মুখুজ্যেমশাই আজকাল সিগারেট খেতে শিখেছেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে' পরিমলবাবুর হাতে একটি সিগারেট দিয়ে নিজেও একটি ধরালেন।

মুখুজ্যেমশাইএর মাথার দিকে তাকিয়ে পরিমলবাবু হঠাৎ বলে বসলেন, এ কি, মুখুজ্যের চুলে যে পাক ধরলো।

মুখুজ্যেমশাই চমকে উঠলেন।—তাই নাকি? দাও না ভাই, তুলে দাও না!

পরিমলবাবু বললেন, আমাকে বলছেন কেন, বাড়ীতে গিন্নি রয়েছে, তাকে বলবেন, বসে বসে তুলে দেবে।

কথাটা শুনে সবাই হো হো করে' হেসে উঠলেন।

সেদিন থেকে কি যে হলো মুখুজ্যেমশাইএর—আসন্ন বার্দ্ধক্যের ভয়ে সর্ব্বদাই তিনি সন্ত্রস্ত হয়ে রইলেন।

ছায়ার কাছ থেকে সরে গিয়ে আর্শীটা তুলে ধরেন চোখের সুমুখে, তারপর তন্ন তন্ন করে' চুলে হাত দিয়ে দেখেন, চুলগুলো বেশ পাকতে আরম্ভ করেছে। একটি একটি করে' তুলে ফেলেন হাতের কাছে যা পান। কিন্তু এ তো একটি দুটি নয়। তুলে যে শেষ করতে পারছেন না!

তার ওপর সুমুখের একটা দাঁত যেন নড়ছে বলে মনে হচ্ছে। আঙুল দিয়ে ধরে নেড়ে দেখেন আর ভাবেন, দাঁতটা পড়েই যদি যায়, সঙ্গে সঙ্গে বাঁধিয়ে ফেলতে হবে।

মুখের চামড়াটা টেনে টেনে দেখেন, নাকের দু'পাশে যেন খাঁজ পড়েছে।

তাহলে সত্যিই কি তিনি বুড়ো হয়ে গেলেন?

মুখুজ্যেমশাই মনে মনে সন তারিখ হিসেব করে' দেখেন তাঁর বয়স হলো বিয়াল্লিশ বছর তিনমাস।

পঞ্চাশ পার না হলে বুড়ো হয় না! তাঁর তো এই সবে বিয়াল্লিশ! এখনও আট বছর বাকি।

কিন্তু ছায়া? হিসেব করে' দেখলেন, তার বয়স উনিশ।

তফাৎটা খুব বেশি বলে' মনে হতে লাগলো! এতদিন সেকথা তাঁর মনেই ছিল না।

সেদিন থেকে এই একটা কথাই বারম্বার তিনি ভাবতে লাগলেন।

এতে আর এমন কি হয়েছে? এমন কত হয়!

কিন্তু সব সময়েই এই এক চিন্তা মুখুজ্যেমশাইকে যেন পেয়ে বসলো।

আর ঠিক সেই সময়েই তাঁর নজরে পড়লো—ইস্কুলের ফার্ষ্ট ক্লাসের ছাত্র যতীন তাঁর বাড়ীর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে!

মুখুজ্যেমশাইকে দেখেই যতীন সরে গেল।

একদিন নয়, দুদিন দেখলেন।

দ্বিতীয় দিন দেখলেন—যতীন দোতলার জানালার দিকে তাকিয়ে।

মুখুজ্যেমশাই কি যেন তাকে বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে সুযোগ তিনি পেলেন না। তার আগেই কোন্‌দিক দিয়ে কেমন করে' যে সে পালিয়ে গেল, মুখুজ্যেমশাই বুঝতেই পারলেন না।

যতীন! নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। প্রিয়দর্শন বুদ্ধিমান ছাত্র যতীন!

মুখুজ্যেমশাই দোতলায় উঠে গেলেন।

ছায়া চিরুণী দিয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। কিন্তু খোলা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কেন?

মুখুজ্যেমশাইকে দেখেই ছায়া তার মাথার কাপড়টা তুলে দিলে। কি যেন তাকে তিনি জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। ছায়ার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন শুধু।

ছায়া বললে, কি দেখছ?

মুখুজ্যেমশাই বললেন, তোমার মুখের হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন তাই ভাবছি।

ছায়া বললে, তোমার দুর্ভাগ্য।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, হঁ্যা ঠিক বলেছ। আমার দুর্ভাগ্য।

মুখুজ্যেমশাই-এর ভাল ঘুম হচ্ছে না রাত্রে। মনে হয় যেন সারাটা রাতই তিনি জেগে থাকেন।

কি যে হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছেন না। অথচ শরীর তাঁর বেশ সুস্থই আছে। সকালে কেমন যেন একটুখানি দুর্ব্বলতা অনুভব করেন।

ভাল একজন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ করবেন ভাবলেন।

ভাবলেন বটে, কিন্তু যাওয়া আর হয়ে উঠলো না।

যাব যাব করছেন, এমন দিনে হঠাৎ একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল।

পাঁচির একখানা চিঠি এলো দেশ থেকে।

মুখুজ্যেমশাই তখন ইস্কুলে। খামের চিঠি। শিরোনামায় ছায়ার নাম।

চিঠিখানা খুলে পড়লে ছায়া।

পাঁচি লিখেছে—

'বাবা যে এত শীঘ্র পর হইয়া যাইবেন তাহা ভাবি নাই। ধন্যি মেয়ে বাবা তুমি! আজ ছ'মাস হইল, বাবা বাড়ী আসিলেন না। চিঠিরও নামগন্ধ নাই। তোমার কাছে বাবা বেশ সুখেই আছে। তুমিও খুব সুখে আছ।

কিন্তু এত সুখ ভগবান সহিবেন না! ধর্ম্মের দিকে চাহিবে। আমরা দিন-রাত তোমার মরণ চাহিতেছি। তুমি কবে মরিবে জানি না। যদি না মর, এখানে তোমাকে একদিন না একদিন আসিতেই হইবে। যখন আসিবে তখন মজাটি টের পাওয়াইয়া দিব। ইতি—পাঁচি

চিঠির কোথাও কোনও সম্বোধন নেই, প্রণাম জানানো নেই, কুশল প্রশ্ন কিছুই নেই।

ছায়া আর একবার চিঠিখানি পড়ছে, এমন সময় যতীন এলো। চিঠিটা ছায়া লুকিয়ে ফেললে চট করে'।

যতীন আজকাল ছায়াকে তুই বলে। জিজ্ঞাসা করলে, কি পড়ছিলি যেন?

—কিছু না দাদা, এসো।

যতীন বললে, একটা কথা বলতে এলাম। তাড়াতাড়ি চলে যাব। আসছে শুক্রবার মাকে নিয়ে আসবো। দুপুরে আনবো। মাষ্টারমশাই তখন থাকবেন না বাড়ীতে। কেমন?

ছায়া বললে, বেশ তাই এনো।

যতীন বললে, আজ তোর মুখখানা অমন শুকনো শুকনো মনে হচ্ছে কেন রে?

জোর করে ছায়া একটু হাসলে। বললে তাই নাকি? তা হবে।

যতীন ধরে ফেলেছে ঠিক!

যতীন তাড়াতাড়ি চলে যাবে বলেছিল, কিন্তু ছায়া আজ যেন তাকে ছাড়তেই চায় না! পাঁচির চিঠিখানা তাকে খুব জোর আঘাত দিয়েছে। যতীনের সঙ্গে কথা বলে সেটা ভুলে থাকতে চায়।

কখন চারটে বেজে গেছে বুঝতেই পারেনি কেউ।

হঠাৎ একসময় ধড়মড় করে উঠে বসলো যতীন। বললে, চললাম।

কিন্তু এমনি মজা, যতীন নীচে নেমেছে, সিঁড়ির কাছে মুখুজ্যেমশাই!

মুখুজ্যেমশাই যতীনকে যেন দেখেও দেখলেন না। মাথায় যেন তাঁর বজ্রাঘাত হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। গায়ের জামা গায়েই রইলো। পা থেকে জুতো পর্য্যন্ত খুললেন না। ছায়ার কাছে গিয়ে চট্ করে' তার হাতখানা চেপে ধরলেন। তারপর থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলেন। মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরুলো না।

ছায়া বুঝলে সবই। তবু বললে, এরকম করছো কেন? কি হয়েছে?

মুখুজ্যেমশাই জোর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, বুঝেছি।

ছায়া একটু হেসে বললে, ভাল।

ছায়া যদি না হাসতো মুখুজ্যেমশাই কি করতেন বলা যায় না, কিন্তু তার হাসি দেখে তাঁর আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো! বললেন, আজ রাত্রেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। জিনিসপত্র সব ঠিক করে' নাও।

ছায়া জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে?

মুখুজ্যেমশাই বললেন, বাড়ী।

চট্ করে' পাঁচির কথা মনে পড়ে গেল ছায়ার।

বললে, তোমাদের বাড়ী আমি যাব না।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, বেশ, আমাদের বাড়ী না যাও, তোমার বাবার কাছে রেখে আসবো তোমাকে।

ছায়া বললে, রাগ করে?

মুখুজ্যেমশাই চুপ করে রইলেন।

ছায়া আবার বললে, চিরদিনের জন্যে?

বলেই সে হাসলে।

আবার হাসি! ছায়ার মুখে একটুখানি হাসি দেখবার জন্যে মুখুজ্যেমশাই একদিন সাধ্য সাধনা করেছেন। ছায়া তখন হাসেনি। আজ অযাচিতভাবে সে হাসছে।

মুখুজ্যেমশাই চুপ করে' রইলেন।

ছায়া বললে, স্কুল থেকে এলে, জামাজুতো খোলো!

কথার জবাব দিলেন না মুখুজ্যেমশাই। গুম্ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বেরিয়ে গেলেন বাড়ী থেকে।

কোথায় গেলেন কিছু বলে গেলেন না।

মুখুজ্যেমশাই ফিরলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে। হাতে এককেটি নারকেলের দড়ি।

দড়িটা ফেলে দিয়ে বললেন, নাও।

ছায়া বললে, দড়ি কি হবে। গলায় দিয়ে ঝুলবো নাকি?

মুখুজ্যেমশাই বললেন, রসিকতা রাখো। জিনিসপত্র বাঁধো।

ছায়া এতক্ষণে বুঝলে, কথাটা সত্যি। বললে, সত্যিই যাবে তাহ'লে?

মুখুজ্যেমশাই বললে, হ্যাঁ সত্যিই যাব।

ছায়া কি যেন ভাবলে। দাদা কিছু জানবে না শুনবে না, কাল এসে দেখবে দোরে তালা ঝুলছে।

তাই হোক্। শীলা তো মরেই গেছে। আবার না হয় আর একবার মরবে।

জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে' মুখুজ্যেমশাই গাড়ী ডেকে আনলেন। দোরে তালা বন্ধ করে' ঝির হাতে চাবি দিয়ে বললেন, তোমার মা না আসুক, আমি ফিরে আসবো। তুমি রোজ এসে তালা খুলবে, ঘর-দোর ঝাড়ামোছা করবে।

মুখুজ্যেমশাই গাড়ীতে উঠলেন। ছায়া উঠলো।

স্টেশন বেশি দূরে নয়। টিকিট কিনে গাড়ীতে উঠতে দেরি হলো না। কামরায় যাত্রী মাত্র কয়েকজন। আঙুলে গোনা যায়। ছায়া বসলো জানলার পাশে। মুখুজ্যেমশাই বসলেন তার সামনের বেঞ্চে।

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

মুখুজ্যেমশাই এতক্ষণ কোনও কথা বলেননি। এবার বললেন।

বললেন, যতীনের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ এবার বল।

ছায়া বললে, বলবো না।

—বলবে না? কেন?

ছায়া বললে, বললেও বিশ্বাস করবে না।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, বিশ্বাস তোমাকে আমি খুবই করতাম, কিন্তু এখন আর করি না।

—ভাল।

—ভাল? মুখুজ্যেমশাই বললেন, আমার অবিশ্বাসে তোমার কোনও ক্ষতি নেই? দুঃখ নেই?

ছায়া চুপ করে রইলো।

—চুপ করে রইলে যে?

ছায়া বললে, চুপ করে' থাকা ছাড়া আমার উপায় নেই। আমার মত মেয়েকে একবার যদি কেউ অবিশ্বাস করে তো তার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা শক্ত।

—তাহলে সে চেষ্টা তুমি করবে না ?

ছায়া বললে, না।

—বেশ, তাহলে চল।

মুখুজ্যেমশাই শুয়ে পড়লেন।

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ট্রেণ চলছে। মাঝে মাঝে ট্রেণ থামছে। আবার চলছে। যাত্রী উঠছে। নামছে। মুখুজ্যেমশাই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ছায়ার চোখে ঘুম নেই। গুম্ হয়ে সে বসে আছে।

কোথায় যাচ্ছে তারা ? কিছু সে জানে না। শুধু জানে সে যাচ্ছে।

ছায়ার বাপের বাড়ী যেতে হ'লে মাঝে একটা জংসন-ষ্টেশনে গাড়ী বদল করতে হয়। কিন্তু গভীর রাত্রে মনে হলো যেন সে জংসন-ষ্টেশনটা পার হয়ে গেল।

জানলাটা ছিল বন্ধ। ছায়া ভাবলে জানলাটা খুলে একবার দেখে—ষ্টেশনটা সত্যিই পেরিয়ে গেল কিনা। জানলাটা খুলবার জন্যে যেই সে হাত বাড়িয়েছে, মুখুজ্যেমশাই হাঁ হাঁ করে' উঠে বসলেন।—খুলো না, খুলো না, খবরদার খুলো না!

ঘুমোননি তাহ'লে মুখুজ্যেমশাই!

ছায়া বললে, কেন ? কি হয়েছে ?

—কি হয়েছে, দেখতে পাচ্ছো না—লোকটা কেমন হাঁ করে' তাকিয়ে রয়েছে তোমার দিকে!

ছায়া বললে, বেশ, খুলবো না। কিন্তু বল—আমরা কোথায় যাচ্ছি।

মুখুজ্যেমশাই বললেন, আমাদের বাড়ী।

—তবে যে তখন বললে—আমাকে রেখে আসবে আমার বাবার কাছে!

মুখুজ্যেমশাই বললেন, না সেখানে যাচ্ছি না, যাচ্ছি আমাদের বাড়ীতে।

ছায়া আর একটি কথাও বললে না। মুখুজ্যেমশাইএর বাড়ীর কথা তার মনে পড়লো। মনে পড়লো পাঁচির কথা। মনে পড়লো তার চিঠির কথা।

মুখুজ্যেমশাই আবার তাকে সাবধান করে দিলেন।

—জানলা খুলো না। এইদিকে পেছন ফিরে বোসো।

স্বামীর আদেশ পালন করলে ছায়া। অপরিচিত মানুষটির দিকে পেছন ফিরেই বসলো।

মুখুজ্যেমশাই আবার শুয়ে পড়লেন।

রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে চারদিক ফর্সা হয়ে আসছে।

ভোরের হাওয়ায় মুখুজ্যেমশাই সত্যিই এবার ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

হৈ হৈ গোলমাল চীৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। কে যেন তাঁকে ঝাঁকানি দিয়ে বললে, উঠুন মশাই উঠুন, উঠুন! এদিকে দেখুন কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

মুখুজ্যেমশাই ধড়মড় করে' উঠে বসলেন। সুমুখে তাকিয়ে দেখলেন ছায়া নেই।

—কোথায় আমার স্ত্রী? ছায়া! ছায়া!

আর ছায়া!

গাড়ী তখন দাঁড়িয়ে গেছে। শেকল টেনেছে এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। এঁকে দেখিয়েই মুখুজ্যেমশাই ছায়াকে বলেছিলেন, দেখছো না লোকটা তোমার দিকে কি রকম ভাবে তাকাচ্ছে। ওর দিকে পেছন ফিরে বোসো।

তিনিই বলছেন, মেয়েটি হঠাৎ এক সময় উঠে গিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে চলন্ত গাড়ী থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

তাই না দেখে তিনি চেন টেনে দিলেন।

তারপর সব শেষ!

হৈ চৈ গোলমাল, থানা, পুলিশ, ছায়া আর ছায়া!

আর কিছুই ভালো করে' বলতে পারেন না মুখুজ্যেমশাই। দু'খানি চিঠি তিনি অমূল্য সম্পদের মত এখনও তাঁর কাছে রেখেছেন। একখানি চিঠি যতীনের, আর একখানি পাঁচির।

সমস্ত পৃথিবী তাঁর ছায়াময় হয়ে গেছে। এই লাইনের ট্রেণে ট্রেণে তিনি ছায়াকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন!

রহস্যময়ী সুন্দরী লুকোচুরি খেলা খেলছে তাঁর সঙ্গে।

কাশীনাথ আর শশিনাথ দুই বন্ধু। কাশীনাথ কালো, শশিনাথ ফরসা। কাশীনাথ গরম, শশিনাথ নরম। কাশীনাথ কানা, শশিনাথ কালা। তবু তারা দুই বন্ধু। হাতিবাগান বাজারের কাছে দুজনের দুটি খাবারের দোকান। এদিকে একটি, ওদিকে একটি। প্রায় মুখোমুখি। কাশীনাথের দোকানে খরিদ্দার আসে। শশিনাথের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। আবার শশিনাথের দোকানে যখন খদ্দেরের ভিড়,—কাশীনাথের তখন কি যে হয় তা সে নিজেই ভাল বুঝতে পারে না ; উনোন-খোঁচানো লোহার ডাণ্ডাটার দিকে হাত বাড়ায়, মনে হয়, ওই ডাণ্ডা দিয়ে শশিনাথের মাথাটা ফাটিয়ে দিয়ে আসে।

একদিন রাত্রে কানা কাশীনাথ এমনি একটা স্বপ্ন দেখলে। স্বপ্ন যে এত স্পষ্ট পরিষ্কার হয়, তা তার জানা ছিল না।

দেখলে, শশিনাথের দোকানে সেদিন দু কড়াই বড় বড় রসগোল্লা নেমেছে। কড়াইয়ের রস তখনও গরম। সে গরম রসের ওপর রসগোল্লাগুলো ভাসছে। শশিনাথ লোহার একটা ঝাঁজরা দিয়ে চেপে চেপে রসগোল্লাগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে রসের ভেতর। এমন সময় কাশীনাথ ঢুকল চুপি চুপি পা টিপে টিপে, পেছন দিক থেকে লোহার ডাণ্ডা হাতে নিয়ে। তার পরেই, বাস, দিলে বসিয়ে সেই ডাণ্ডা—শশিনাথের মাথায়। চিৎকার ক'রে শশিনাথ মুখ থুবড়ে পড়ল সেই গরম রসের কড়াইয়ের ওপর। মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। কাঁচা রক্তে রাঙা হয়ে গেল রস আর রসগোল্লা। কাশীনাথ ছুটতে লাগল প্রাণের ভয়ে। পেছনে বিস্তর লোক তাকে তাড়া করেছে। ছুটে সে পালাতে পারলে না। লোকজন তাকে ধ'রে ফেললে। কোত্থেকে হৈ-হৈ ক'রে পুলিস এসে গেল।

মুখ দিয়ে কেমন যেন একটা অস্বাভাবিক আওয়াজ বেরুচ্ছে কাশীনাথের। গোঁ-গোঁ করতে করতে তার ঘুম ভাঙল।

গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এক গ্লাস জল খেয়ে একটা স্বস্তির

নিশ্বাস ফেললে কাশীনাথ। সবই স্বপ্ন! তাকে তা হ'লে পুলিসে ধরে নি! বাঁচা গেল।

নাঃ, আর সে ও-রকম বাজে কথা ভাববে না। পরের মন্দ না ভাবাই ভাল। শশিনাথ করুক উন্নতি। যত বড় হতে পারে হোক।

সেদিন সন্ধ্যায় কাশীনাথ তার কানা চোখ মিট্ মিট্ ক'রে আবার দেখলে—শশিনাথের দোকানের সামনে অনেকগুলো খদ্দের দাঁড়িয়ে। হাত বাড়িয়ে পয়সা নিচ্ছে আর কাঠের বাক্সে পুরছে। এমন সময় কাশীনাথের দোকানে একজন খরিদ্দার এল। চেনা খরিদ্দার।—ছুটো সন্দেশ আর চার পয়সার দই নেবে। শালপাতার ঠোঙা তৈরি করতে করতে কাশীনাথ বললে, খবরের কাগজ পড়েছেন দাদা?

—কি?

কাশীনাথ বললে, গুঁড়ো ছুধ খেয়ে মেদিনীপুরে সাতজন লোক মারা গেছে।

খদ্দের বললে, গুঁড়ো ছুধের কারবার তো শুনেছি তোমরাই কর।

কাশীনাথ বললে, ভগবানের দিব্যি ক'রে বলছি দাদা, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর-সংসার করি, সে রকম ছুর্মতি যেন কোনদিন না হয়। তবে হ্যাঁ, নাম করব না, সামনা-সামনি দোকান করি, বলবে—ব্যাটার হিংসে হচ্ছে, নইলে এখুনি হাঁক মেরে ব'লে দিতে পারতুম—বাজার থেকে পেটি পেটি গুঁড়ো ছুধ আমি কিনি না, কেনে ওই—। না বাবা, কাজ নেই, বলবে—আমার খদ্দের ভাঙাচ্ছে!

উত্তেজনার মুখে কথাটা বেশ জোরেই বলেছিল কাশীনাথ। শশিনাথ কানে খাটো তাই শুনতে পেলে না।

শশিনাথও বলে। তবে চেঁচিয়ে বলে না, গালাগালিও দেয় না। হাত দিয়ে খদ্দের বিদেয় করে, আর মুখ দিয়ে আপন মনেই অনর্গল বলতে থাকে: গুঁড়ো ছুধের দই বেচে, পানতুয়া বেচে দোতলা দালান তুলবি তোল, আমি বাবা যেমন তেমনই থাকি।···কালো অলম্বুস্ মোষের মতন চেহারাও যেমন, মনটাও তেমনি।

—কাকে কি বলছ শশি?

শশিনাথ একটু হেসে বলে, কাউকে বলি নি আজ্ঞে। ওসব বড় নোংরা কথা, আপনাদের শুনে কাজ নেই।

রাত্রি হয়ে গেছে। কাশীনাথ দোকান বন্ধ করবে।

টাকাপয়সাগুলি একটি কাপড়ের থলিতে ঢুকিয়ে কোমরে বাঁধলে প্রথমে। ধূপদানিতে আগুন দেওয়া হয়েছে। ধূপদানিটি নিয়ে গণেশ ঠাকুরকে ধোঁয়া খাইয়ে, কাঠের ক্যাশবাক্সটিতে ধোঁয়া দিলে, তারপর দোকানের চারিদিকে ঘুরিয়ে ধোঁয়া দিয়ে যথাস্থানে ধূপদানিটি নামিয়ে রাখলে। গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলে চারিদিকে। তারপর গণেশ ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বেরিয়ে এল বাইরের ফুটপাথে। শো-কেস, দরজা টেনে টেনে বন্ধ করলে। বড় বড় তিনটি তালা লাগালে। প্রত্যেকটি তালা দু হ'াত দিয়ে চেপে ধ'রে প্রাণপণ শক্তিতে টেনে ঝুলে দেখলে বন্ধ হয়েছে কি না, তারপর দলা-পাকানো খবরের কাগজে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে সুমুখে তাকিয়ে দেখলে, শশিনাথ দোকান বন্ধ ক'রে কাগজ পুড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাবি বাজাচ্ছে।

কাশীনাথ এল শশিনাথের কাছে।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, বেচাকেনা কেমন? শশিনাথ বললে, কোন রকম।

দুজনে হাঁটতে আরম্ভ করলে।

শশিনাথ বললে, এবারের পেটিটার ওজন কম ছিল। কাশীনাথ বললে, ও-রকম থাকে।

শশিনাথ বললে, কাল দু পেটি মাল বেশী চাই।

কেন?

দুজন দোকানদার নেবে বলেছে।

কাশীনাথ বললে, তুমি বুঝি সবাইকে শেখালে এই গুঁড়ো দুধের কাজ?

শশিনাথ বললে, শিখুক না। এতেও তো লাভ আছে। শেষে দুটোই চালাব। দোকানও চালাব, ওটাও চালাব। এরই সূত্র ধ'রে চলল তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—কত হাসি, কত গল্প!

শ্যামবাজারের মোড় থেকে দুজনকে যেতে হবে দুদিকে। গল্প তখনও তাদের শেষ হয়নি। সুতরাং বসতে হ'ল একটা বাড়ির রকে। শহরের পথ জনবিরল হয়ে এল। সুমুখের ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড ফাঁকা হয়ে গেল। মল্লিকদের পেটা ঘড়িতে একটা বাজল। চমক ভাঙল কাশীনাথের: ভোরে উঠতে হবে। আজ চলি।

এস।—বলে বিদায় নিলে শশিনাথ।

এমনি প্রত্যহ। দশ বছর আগে এমনি ক'রে গ'ড়ে উঠেছিল তাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব।

দশ বছর পরে, দেখা গেল, দুটো দোকানই তাদের বড় হয়েছে। দশ-বারোজন কর্মচারী কাজ করছে প্রত্যেকটি দোকানে। দোকানের মাথায় প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কাচের শো-কেসে নানারকমের মিষ্টি সাজানো। পেছনে ব'সে খাবার জায়গা। তারও পেছনে দিবারাত্রি সন্দেশ তৈরি হচ্ছে।

কাশীনাথ, শশিনাথ এখন মস্ত লোক। মুর্গিহাটায় তাদের মস্ত কারবার। এখন তাঁরা গুঁড়ো দুধের পাইকারী ব্যবসাদার। অষ্ট্রেলিয়া থেকে মাল আসছে। হল্যাণ্ড থেকে জাহাজ আসছে। লক্ষ লক্ষ টাকার লেন-দেন চলছে।

সামনে পুজো। শশিনাথ বললে, হাওড়া স্টেশনের ওপারে কি আছে তা তো জান না। চল বেড়িয়ে আসি।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাবে? শশিনাথ বললে, পুরী।

কাশীনাথ রাজি হয়ে গেল। ঠিক হ'ল—দুজনের যা খরচ হবে, হিসেব ক'রে এ দেবে অর্ধেক, ও দেবে অর্ধেক।

শশিনাথ আগে বিড়ি টানত, এখন সিগারেট খায়। সিগারেট খায়, পান খায়, মদ্যপান করে।

কাশীনাথের কিন্তু ও-সব বালাই নেই। মদ্যপান দূরের কথা, সিগারেটও খায় না, পানও খায় না।

শশিনাথ বললে, নিতান্ত বে-রসিক তুমি। এই ব'লে সে কয়েকটা দামী দামী সিগারেটের টিন কিনে নিলে। জীবনের সাধ মিটিয়ে নেবার জন্যে বেড়াতে বেরিয়েছে, এ সময় কৃপণতা করার কোনও মানেই হয় না।

পুরী গিয়ে পৌঁছলো দুই বন্ধু। ভাল একটা হোটেলে গিয়ে উঠল।

শশিনাথ বললে, মদ খাব। কাশীনাথ বাধা দিলে না। বললে, খাও।

খুব দামী বিলিতী মদ এল। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক সব কিছুই এল। শশিনাথ তার মনের সাধ মিটিয়ে মদ্যপান করলে। কাশীনাথ নিজের হাতে বোতল খুলে কাঁচের গ্লাসে ঢেলে দিতে লাগল।

পরের দিন ঠিক হ'ল—সমুদ্রস্নান করবে তারা। সমুদ্রে স্নান ক'রে জগন্নাথের মন্দির দর্শন করবে। এত লোক স্নান করছে সমুদ্রে, তারাই-বা করবে না কেন? দুই বন্ধু প্রস্তুত হ'ল কোমরে গামছা বেঁধে। মনে হ'ল যেন দিগ্বিজয় করতে চলেছে। ধীরে ধীরে জলে গিয়ে নামল।

এই ঢেউটা নিতে হবে কিন্তু।—বলতে বলতে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে তাদের আছড়ে ফেলে দিয়ে গেল বালির ওপর। মন্দ লাগল না। হাসতে হাসতে আবার এগিয়ে গেল দুই বন্ধু।

কাশীনাথ পূর্ববঙ্গের মানুষ। নদী-নালা-খাল-বিলে ভরা পূর্ববঙ্গ। সমুদ্রের লোনা জলে নাকানিচুবানি খেতে পারে, কিন্তু জলে ডুবে মরবে না সহজে।

আর শশিনাথ? কলকাতা শহরেই চিরকাল। লালদীঘি, গোলদীঘি চোখে দেখেছে মাত্র। স্নান করেছে কলে চৌবাচ্চায়। সেই শশিনাথ নেমেছে সমুদ্রের জলে। বার দুই-তিন ঢেউ নেবার পর তার সাহস গেল বেড়ে। ক্রমাগত এগিয়ে চলল সামনের দিকে। কাশীনাথও যাচ্ছিল তার পাশে পাশে। একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল অনেকদূরে। ঢেউ স'রে গেল। কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। কিন্তু শশিনাথ কোথায়? অনেক দূরে মনে হ'ল যেন ভেসে যাচ্ছে একটা মানুষ। হাত দুটো একবার উপরের দিকে উঠল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না। কাশীনাথ চিৎকার করে উঠল, শশিনাথ! শশী! একে কালা, তায় আবার সমুদ্রের গর্জন। কারও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। নুলিয়া ছেলেরা তীরে সাঁতার কাটছিল। কাশীনাথ তাদের ডাকলে হাতের ইশারায়। আবার তেমনি ইশারা ক'রেই দেখিয়ে দিলে তার বন্ধু ডুবছে। নুলিয়া ছেলেরা বকশিসের লোভে ছুটল তীরের মত। তারপর চারজনে ধরাধরি ক'রে অতি কষ্টে যে-মানুষটিকে তারা তুলে নিয়ে এল সে শশিনাথ।

অনেকখানি লোনা জল খেয়ে পেটটা তখন তার ফুলে ঢাকের মত হয়ে গেছে। মুখ দিয়ে গল গল ক'রে জল বেরুচ্ছে। চোখ দুটো লাল। তাকিয়ে আছে, কিন্তু কথা বলতে পারছে না।

বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেল। কেউ বললে, ডাক্তারখানায় নিয়ে যান। কেউ বললে, চিৎ ক'রে শুইয়ে দিন। কেউ বললে, উপুড় ক'রে দিন। কেউ বললে, ম'রে গেছে। কেউ বললে, মরে নি।

নুলিয়া ছেলেরা কিন্তু কারও কথা শুনলে না, কোনও কথার জবাব দিলে না, মিনিট দশ-পনেরো ধ'রে কত রকম কি সব করলে, শশিনাথের মুখ দিয়ে হড়্‌হড়্‌ ক'রে খুব খানিকটা জল বেরিয়ে গেল, তারপর হঠাৎ এক সময় তাকে তুলে বসিয়ে দিয়ে একটা ছেলে বললে, এবার এঁকে বাড়ি নিয়ে যান বাবু।

শশিনাথের দু'চোখ বেয়ে দর দর ক'রে জল গড়িয়ে এল। কাশীনাথের হাত দুটো জড়িয়ে ধ'রে সে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল। কাশীনাথ বললে, কাঁদে না চুপ কর।

শশিনাথ বললে, আজ আমি ম'রে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে বাঁচালে।

কাশীনাথ বললে, না, আমি বাঁচাই নি। নুলিয়াদের দেখিয়ে দিয়ে বললে, বাঁচিয়েছে এরা।

শশিনাথ বললে, চল, ওদের দশ টাকা বকশিস দেব। নুলিয়া ছেলেগুলো বললে, না বাবু, আমরা কুড়ি টাকা নেব। পাঁচ টাকা ক'রে এক-একজন।

কুড়ি টাকাই তাদের দেওয়া হ'ল।

এই দুর্ঘটনার পর, পুরীতে তারা আর রইল না। ফিরে এল কলকাতায়। এসেই শশিনাথ হিসেবের কাগজ নিয়ে বসল। পুরী যাওয়া-আসা খরচের হিসেব। কাশীনাথ বললে, কত ছোটখাটো খুচরো খরচ হয়েছে আমাদের, সে সব কি তোমার মনে আছে?

হাসতে হাসতে শশিনাথ তার পকেট থেকে ছোট একটি খাতা বের করলে। দেখা গেল, কোথায় দু' পয়সার পান কিনেছে, তাও সে লিখতে ভোলে নি। কাশীনাথ ভেবেছিল, মদ ও নিজেই খেয়েছে, কাজেই সে খরচের আধাআধি বখরা নিশ্চয়ই তাকে দিতে হবে না। তার ওপর নুলিয়াদের বকশিস কুড়ি টাকা। শশিনাথের জীবন বাঁচিয়েছিল তারা। সে খরচ শশিনাথের একার। কিন্তু আশ্চর্য, সব টাকা একসঙ্গে যোগ ক'রে নিতান্ত নির্লজ্জের মত শশিনাথ তার অর্ধেক চেয়ে বসল কাশীনাথের কাছে। কাশীনাথ তবু একবার জিজ্ঞাসা করলে, এ সবের অর্ধেক দিতে হবে আমাকে? শশিনাথ বললে, যাবার আগে সেই রকম কথাই হয়েছিল। কাশীনাথ আর একটি কথাও বললে না। দিলে। তার আধাআধি ভাগের প্রতিটি পাই পয়সা মিটিয়ে দিয়ে উঠে গেল সেখান থেকে।

ষোল কলা পূর্ণ হ'ল সেই দিন, কাশীনাথ যেদিন শুনলে, যে টিকিটে তারা পুরী গিয়েছিল, রেলের সে টিকিট দুটোও শশিনাথ কেনে নি। পূজোর ছুটিতে রেল-কোম্পানি সে বছর এক মাসের কনসেশন টিকিট বের করেছিল। শশিনাথের দু' শালা দু'খানি টিকিট কিনে পুরী গিয়ে সাত দিনের ভেতর ফিরে এসেছে। টিকিটে কোথাও আঁচড় পড়ে নি। টিকিট দুটো তারা

ফেলে দিতে যাচ্ছিল, শশিনাথ কুড়িয়ে নিয়ে বলেছিল, টিকিটের মেয়াদ এখনও ফুরোয় নি। দেখি, যদি আর-একবার ব্যবহার করতে পারি।

সেই টিকিটই তারা ব্যবহার করেছে। শশিনাথের জয় হোক!

কাশীনাথ একবার স্বপ্ন দেখেছিল, শশিনাথকে সে মেরে ফেলেছে। সে আজ অনেক দিনের কথা। আজ মনে হ'ল, পুরীর সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সেদিন সে নুলিয়াদের বোধ করি না ডাকলেই ভাল করত।

আরও কিছুদিন পরে।

অনেক টাকার মাল ধ'রে রেখেছিল দুই বন্ধু। কাশীনাথ পঞ্চাশ হাজার, শশিনাথ পঞ্চাশ হাজার—এক লক্ষ টাকার গুঁড়ো দুধের পেটি। শশিনাথের ইচ্ছা, দর না উঠলে মাল সে ছাড়বে না। অনেক টাকা লাভ করবে।

কাশীনাথ এসে খবর দিলে, হল্যাণ্ডের জাহাজ এসে গেছে। বাজারে প্রচুর মাল। দর প'ড়ে যাচ্ছে। এ সময় মাল ধ'রে রাখলে অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে। শশিনাথ বললে, ছাড়তে হয় তুমি ছাড়। আমি আরও এক সপ্তাহ দেখব।

এক সপ্তাহ দেখবার দরকার হ'ল না। দু দিন পরেই দেখা গেল, বাজারের দর অনেক নেমে গেছে। এখন ছেড়ে দিলে তার পনেরো হাজার টাকা লোকসান। আরও দেরী করলে আরও বেশী লোকসানের সম্ভাবনা।

পনেরো হাজারের ওপর দিয়েই যাক।—ব'লে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, ও মাল আমি আজই বিক্রি ক'রে ফেলব।

শশিনাথ বললে, বেশ, তবে আমাকেই দাও। টাকার হিসেব ক'রে শশিনাথ চেক-বই বের করলে।

কাশীনাথ বললে, এত মাল তুমি কোন্ সাহসে ধরছ? ডুববে যে!

শশিনাথ বললে, ডুবেছিলাম একদিন পুরীর সমুদ্রে। সেদিন তুমিই বাঁচিয়েছিলে। আবার যদি ডুবি এই শুকনো ডাঙায়, তুমিই বাঁচাবে। এই ব'লে সে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মুখে কিছু বললে না কাশীনাথ। কিন্তু মনে মনে বললে, এমনি হো-হো ক'রে কাঁদবে যেদিন মাথায় হাত দিয়ে সেই দিন আমি হাসব।

হাসবার সুযোগ কিন্তু পেলে না কাশীনাথ।

দেখা গেল, শশিনাথ হাত মিলিয়েছে মস্ত বড় ধনী এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে। হল্যাণ্ডের জাহাজের সংবাদ মিথ্যা, আর গুঁড়ো দুধ বলতে যেখানে যা কিছু ছিল—শশিনাথের কল্যাণে সবই গিয়ে ঢুকল মাড়োয়ারীর গুদামে।

লাভ হ'ল প্রচুর, কিন্তু সে লাভের কতটুকু অংশ পেলে শশিনাথ আর কতটুকু পেলে ধনী মাড়োয়ারী তার হিসেব কেউ রাখলে না। শুধু জ্ব'লে পুড়ে মরতে লাগল কাশীনাথ তার লোকসানের জ্বালায়।

নিতান্ত ইতরের মত শশিনাথ যে-খেলা খেললে তার সঙ্গে, সেটাকে সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলে না। কাশীনাথের আহার গেল ছুটে, নিদ্রা গেল টুটে, দিবারাত্রি শুধু সে একটি কথাই ভাবতে লাগল—কেমন ক'রে সে এর প্রতিশোধ নেবে।

বাজারে তখন একটা মালের চাহিদা খুব বেশী। অষ্ট্রেলিয়ার তৈরী 'ফুল-ক্রিম মিল্ক-পাউডার'। কেউ দিতে পারছে না। অষ্ট্রেলিয়া থেকে খবর এসেছে, কোম্পানি কারবার গুটিয়ে দিয়েছে। সে জিনিস আর পাওয়া যাবে না। সামান্ত যার কাছে যেটুকু আছে, হাতছাড়া করতে চায় না কেউ। দিনের পর দিন দাম তার বেড়েই চলেছে।

কাশীনাথ একদিন শশিনাথের বাড়ি গিয়ে বললে, অষ্ট্রেলিয়ান ফুল-ক্রীম চাই? শশিনাথ চমকে উঠল। মনে হ'ল যেন কাশীনাথ বলছে—আকাশের চাঁদ চাই? শশিনাথ বললে, নিশ্চয়ই চাই। কিন্তু পাবে কোথায়?

সে-সব তোমার জানবার কি দরকার? চাই কি না বল।

শশিনাথ বললে, চাই। কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কত?

যত দিতে পার।

কাশীনাথ বললে, কাল বলব, কত দিতে পারি।

দরদস্তুর সব ঠিক হয়ে গেল। কাশীনাথের নতুন বাড়ির পাশেই যে গুদাম-ঘর, মাল ডেলিভারি নিতে হবে সেইখান থেকে। কাশীনাথ বললে আর যদি বল তো মাল পৌঁছিয়েও দিতে পারি তোমার গুদোমে।

না, আমি তোমার গুদোম থেকেই নেব—বললে শশিনাথ।

সেই ভাল।—ব'লে নিশ্চিন্ত হয়ে কাশীনাথ বাড়ি ফিরে গেল।

শশিনাথ কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলে না। তাকে জব্দ করবার এ এক নতুন চাল নয় তো? কিন্তু তাই বা কেমন ক'রে হবে? কাশীনাথ তো

অগ্রিম টাকা চাইলে না! শশিনাথের মাথার ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। এই দুর্লভ বস্তু সে পেলে কোথায়?

পরের দিন সে হেঁটে হেঁটেই চলতে লাগল কাশীনাথের বাড়ীর দিকে। চুপি চুপি তার গুদামে গিয়ে দেখবে, মাল সেখানে সত্যই মজুত আছে কি না! অর্ডার দিতে হয় তার পর দেবে।

কাশীনাথের বাড়িতে আলো জ্বলছে। গ্যারেজে নতুন গাড়িখানাও রয়েছে। বাড়িতেই আছে সে।

যাক, শশিনাথ তাকে ডাকলে না। চোরের মত চুপি চুপি এগিয়ে গেল তার গুদোমের দিকে। গুদোম মানে বাড়ির পেছনের দিকে টিনের একখানা লম্বা ঘর।

শশিনাথ দেখলে, গুদামের দরজায় তালা নেই। টিনের কপাটে হাত দিয়ে একটু ফাঁক করে অতি সন্তর্পণে শশিনাথ ভেতরে ঢুকে পড়ল। আলো জ্বলছে না। চারিদিক অন্ধকার। ফিস ফিস ক'রে কারা যেন কথা বলছে। দুজন লোক রয়েছে ব'লে মনে হ'ল। একজন দাঁড়িয়ে, একজন ব'সে। যে দাঁড়িয়ে, তার হাতে একটা টর্চ।

শশিনাথ তাদের চিনতে পারে নি। ডাকলে, কাশীনাথ!

কাশীনাথ চমকে উঠল। বললে, কে?

টর্চের আলোটা এসে পড়ল শশিনাথের মুখের ওপর। হঠাৎ সেখানে বজ্রপাত হ'লেও বুঝি এতটা বিস্মিত হত না কাশীনাথ! তাড়াতাড়ি শশিনাথের দিকে সে এগিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখানে? শশিনাথ বুঝতে পারছিল না, কি জবাব দেবে। ফ্যালফ্যাল ক'রে কাশীনাথের মুখের পানে সে তাকিয়ে রইল। কাশীনাথের বুকের ভেতরটা তখন টিপটিপ করছে। শশিনাথকে এক রকম ঠেলতে ঠেলতে সেখান থেকে বাইরে নিয়ে এল। বললে, চল, বসবে চল।

শশিনাথ বললে, না, বসব না। আমার কাজ আছে। আমি বলতে এসেছিলাম—

কথাটা কাশীনাথ শেষ ক'রে দিলে: অষ্ট্রেলিয়ান মিল্ক-পাউডার তুমি নেবে না। এই তো?

শশিনাথ বললে, দু-চার দিন পরে নেব।

কাশীনাথ বললে, বুঝেছি। 'বুঝেছি' ব'লে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

'এস' কি 'যাও' কোনও কথাই বললে না শশিনাথকে। শশিনাথও কিছু না ব'লে হেঁটে হেঁটে চ'লে গেল তার চোখের সুমুখ দিয়ে। রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল শশিনাথ। কাশীনাথ চিৎকার ক'রে উঠল, শয়তান!

পুলিস কিন্তু এল না রাত্রে। পুলিসও এল না, কাশীনাথের চোখে ঘুমও এল না।

এই কথা যদি জানাজানি হয়ে যায়, এ-বাজারে আর ক'রে খেতে হবে না কাশীনাথকে। শশিনাথ তার পরম শত্রু। এ সুযোগ সে ছাড়বে না কিছুতেই। তার চেয়ে—

কাশীনাথ উঠে বসল। আলো জ্বালালে। আলমারি খুলে তার নতুন-কেনা অটোমেটিক রিভলভার ঠিক ক'রে রাখলে। কাঁচা টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া-আসা করতে হয় কলকাতার রাস্তায়। কাশীনাথ আর শশিনাথ দু'জনেই লাইসেন্সের দরখাস্ত করেছিল দুটি রিভলভারের জন্যে। অনেক তদ্বির-তদারক ক'রে অনেক কষ্টে কাশীনাথ লাইসেন্স পেয়েছে। শশিনাথ পায় নি।

পরের দিন বাজারে গেল কাশীনাথ। শশিনাথের দেখা পেলে না। সে আসে নি।

আসবে কেন? পুলিসে খবর দিয়ে চুপ ক'রে বসে আছে বাড়িতে। আর নয়তো কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছে।

কাশীনাথ বাড়ি ফিরে এল। সন্ধ্যা তখনও হয় নি। ভাবলে শশিনাথের সঙ্গে একটা এপয়েন্টমেণ্ট করা যাক্—পোষ্টকার্ড লিখে। একখানা পোষ্টকার্ড টেনে লিখতেও গেল। কিন্তু না, পোস্টকার্ডখানা সাক্ষী থেকে যাবে। তার চেয়ে—টেলিফোনে কথা বলা ভাল।

টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখলে কাশীনাথ। ডাকলে, হরিশ!

হরিশ এসে দাঁড়াল: বলুন।

কাশীনাথ বললে, চট ক'রে তুমি চলে যাও শশিনাথের বাড়ি। এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা। বল গিয়ে, ঠিক সাতটার সময় সে যেন তার বাড়িতে আমার জন্যে অপেক্ষা করে। আমি যাচ্ছি।

হরিশ চলে গেল। এখনও অনেক দেরি। গাড়ি নিয়ে তার বাড়ি

পৌঁছতে পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না। সময় যেন কাটতে চায় না কিছুতেই। কাশীনাথ বেরিয়ে এল বাড়ির বাইরে।

ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করলে, গাড়ি বের করব ?

—কর।

ড্রাইভার গাড়ি বের করছে, কাশীনাথ পায়চারি করছে বাড়ির সামনে। জুতো জোড়াটা নতুন কিনেছে। কিচকিচ আওয়াজ হচ্ছে। তা হোক। চমৎকার জুতো। কিন্তু কালো রঙের জুতো না কিনলেই পারত। তার গায়ের রঙ কালো, তার ওপর কালো রঙের জুতো! ব্রাউন রঙের আর এক জোড়া কিনতে হবে।

রাম-রাম!

মুখ তুলে চাইতেই দেখে, দুধের বাজারের দালাল কিষণচাঁদ।

কাশীনাথ জিজ্ঞাসা করলে, কি খবর কিষণচাঁদ ?

কিষণচাঁদ বললে, কুছু না বাবুসাব। এই দিক দিয়ে একঠো তাগাদায় যাচ্ছি—

বলেই সে কাশীনাথের একটু কাছ ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। চুপিচুপি বললে, হাঁ বাবু, শুনেছি নাকি অষ্ট্রেলিয়ান ফুল-ক্রিম এসে গেছে বাজারে ?

কাশীনাশ বললে, কোথায় শুনলে ? শশিবাবুর কাছে ?

—না, শশিবাবুর সঙ্গে আমার মুলাকাৎ হয় নাই। আমি শুনেছি মথুরা প্রসাদের গদিতে। আবার শুনছি ঠিক-সই রকমের টিন বানিয়েছে, লেবিল বানিয়েছে, বাহারসে চিনা যায় না, ভিতরে রদ্দি মাল পুরিয়ে দিয়েসে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল। কিষণচাঁদ বললে, আপনি যান বাবুসাব, আবার দেখা হবে। রাম রাম!

কিষণচাঁদ চ'লে গেল।

কাশীনাথ দাঁতে দাঁত চেপে ধরল।—এ ঠিক শশিনাথের কাজ।

এখন ছ'টা বাজছে। আর এক ঘণ্টা। তার পরেই সব শেষ। চিরদিনের জন্যে তার মুখ বন্ধ হয়ে যাবে।

হরিশ ফিরে এল। শশিনাথের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। বাড়িতেই থাকবে সে।

কাশীনাথ আজ কোট গায়ে দিয়েছে। পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, ঠিক আছে।

হরিশ জিজ্ঞাসা করলে, আমি যাব সঙ্গে ?

কাশীনাথ বললে, না।

ড্রাইভারকে বললে, তুমিও নাম। আমি একাই যাব।

কাশীনাথ গাড়ি চালাতে খুব বেশীদিন শেখে নি। ড্রাইভার বললে, থাকি না আমি আপনার সঙ্গে ?

কাশীনাথ ধমক দিয়ে উঠল, না না।

এই বলে সে নিজেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

শশিনাথ বাড়িতে ব'সে আছে কাশীনাথ আসবে ব'লে। সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল, কাশীনাথ এল না।

শশিনাথ ভাবলে বুঝি সে তার সঙ্গে রসিকতা করেছে। আসবে না। তার বাড়িতে একবার টেলিফোন করে দেখা যাক্।

উঠতে যাবে, ঘড়িতে তখন আটটা বাজতে মিনিট-পাঁচেক দেরি, এমন সময় হো-হো ক'রে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল কাশীনাথ।

শশিনাথ কেমন যেন অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালে। তাকিয়ে আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারলে না। এ যেন অন্য কাশীনাথ! এত সুন্দর হাসি কাশী-নাথের মুখে!

শশিনাথ বললে, এত হাসি কিসের ?

কাশীনাথ বললে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি তোমাকে।

—তাতে কি হয়েছে ?

হয়েছে অনেক কিছু।—বলতে বলতে কাশীনাথ বসল। বললে, দেখ, আজ তোমাকে সব কথা খুলে বলি। সারাটা জীবন ধ'রে কি করলাম আমরা? এমন কোনও খারাপ কাজ নেই যা আমরা করি নি। তুমি কিন্তু আমাকেও ছাড়িয়ে গেলে। বেশ ভেবে চিন্তে আমার পনেরো হাজার টাকা লোকসান করিয়ে দিয়ে তোমার কত লাভ হ'ল জানি না—

শশিনাথ প্রতিবাদ করতে চাইলে। বললে, না না, সেটা হচ্ছে গিয়ে—তুমি আমার কথা শোন—

কোনও কথা শুনতে চাই না।—কাশীনাথ বললে, আমাকে বলতে দাও। পনেরো হাজার টাকা নয়, তুমি আমাকে ঠকালে—সেইটা আমি কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। কেমন ক'রে তোমাকে ঠকাব, কেমন ক'রে তোমার

সর্বনাশ করব—সেই কথাটাই ভাবতে লাগলাম দিনরাত। শেষে অনেক কষ্ট ক'রে অস্ট্রেলিয়ান দুধের টিন তৈরি করলাম, হুবহু নকল লেবেল ছাপলাম। তোমাকে বিক্রি করবার জন্যে নয়। বিক্রির নাম ক'রে তোমার গুদোমে মাল পাঠিয়ে দিয়ে তোমাকে পুলিসে ধরিয়ে দেব ব'লে। কিন্তু সব গেল ভেস্তে। তুমি নিজে গিয়ে হাজির হ'লে আমার গুদোমে। চোরেব মত চুপিচুপি গিয়ে সব কিছু দেখে ফেললে।

শশিনাথ বললে, কি দেখে ফেললাম?

—দেখলে না? আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম টর্চ নিয়ে, আর হরিশ লেবেল আঁটছিল!

শশিনাথ বললে, না। সত্যি বলছি আমি কিছুই দেখতে পাই নি।

কাশীনাথ খানিক থেমে কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, তা হ'লেই দেখ কি রকম মতিভ্রম! অথচ আমি ভাবলাম, তুমি সব দেখে গেলে। গিয়েই পুলিসে খবর দেবে। বাজারে জানাজানি হয়ে যাবে, লজ্জায় আমি আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পারব না। কাববার গুটিয়ে আমাকে স'রে পড়তে হবে। তাব চেয়ে।—তুমি তো জান আমি রিভলভারের লাইসেন্স পেয়েছি, ভাবলাম সেই রিভলভার দিয়ে তোমাকে একবারে শেষ ক'রে দিই—তোমার মুখ চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাক।

শশিনাথ ন'ড়ে-চ'ড়ে বসল। ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল।

কাশীনাথ বললে, বাজারে গেলাম, দেখলাম তুমি যাও নি। হরিশকে পাঠালান তোমার কাছে।

শশিনাথ আর ব'সে থাকতে পারছে না। চোখ দুটো বড বড় হয়ে গেছে। পেছনের দরজাটা খোলা। ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে কি না একবার তাকিয়ে দেখে নিলে।

কাশীনাথ বললে, তোমাকে সাতটার সময় বাড়িতে থাকতে বলেছিলাম।

শশিনাথ বললে, হ্যাঁ, সাতটা।

শশিনাথ আর কথা বলতে পারছে না। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে কাশীনাথের হাতের দিকে। হাতটা সরিয়ে কি ছুটে পালাবে?

সেই দিকে তাকিয়েই শশিনাথ অতি কষ্টে উচ্চারণ করলে, তুমি কি রিভলভার নিয়ে এসেছ?

কাশীনাথ আবার হো-হো ক'রে হেসে উঠল। বুঝতে পারলে, মৃত্যুর ভয়ে শশিনাথ আধ মরা হয়ে গেছে। বললে, না না, তোমার ভয় নেই। সাতটার সময় দেখা যদি হ'ত, তা হ'লে সত্যি আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম। এখন আর মারব না। তুমি শুধু শোন আমার কথাগুলো শেষ পর্যন্ত।

শশিনাথের চোখ দিয়ে জল এসে গেল। বললে, বল।

কাশীনাথ বললে, নিজেই গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম তোমার এখানে। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিলাম না, হরিশকে নিলাম না। নিলাম শুধু আমার সেই অটোমেটিক রিভলভারটা—সাতটা চেম্বার সাতটা বুলেট দিয়ে ঠাসা।

কিন্তু কে জানত এমন হবে? এখান থেকে বেশী দূরে নয়—তোমার বাড়ীর সুমুখে রাস্তার এই যে বাঁকটা—ওইটে পেরিয়েই লালরঙের রকওয়ালা বাড়িটার কাছ-বরাবর এসে গেছি, হঠাৎ দেখি সুমুখে একটা প্রকাণ্ড লরি আসছে। সেই লরিটাকে পাশ কাটাতে গিয়ে হাতটা ঠিক রাখতে পারলাম না, একটা ল্যাম্প-পোস্টের গায়ে জোরসে লাগালাম ধাক্কা। মাথাটা গেল ঘুরে—কি যে হ'ল বুঝতে পারলাম না, আবার আর এক ধাক্কা—লাল বাড়িটার রকে। আমাতে তখন আর আমি নেই! সব শেষ। চারিদিক অন্ধকার! কিন্তু সে শুধু কিছুক্ষণের জন্যে। তার পরেই সব পরিষ্কার। তখন এ পৃথিবীর রঙ গেছে বদলে। সব দেখতে পাচ্ছি, সব বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার কিছুই করবার নেই। মনে হচ্ছে, তোমরা কে? কারও সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমার স্ত্রী পুত্র কন্যা—কেউ আমার নয়। আমি একা, আমি স্বাধীন, আমার কোনও প্রয়োজন নেই, আমার কোনও কষ্ট নেই, দুঃখ নেই, অভাব নেই; কারও ওপর কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই—শুধু আনন্দ। আনন্দ ছাড়া আর কিছু নেই। কিন্তু সে অনন্দ আমি উপভোগ করতে পারছি না ভাই। এতদিন ধ'রে পৃথিবীর সঙ্গে যে সম্বন্ধ পাতিয়েছি—শুধু স্বার্থের সম্বন্ধ। শুধু আমি আর আমার। আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার ঘর, আমার বাড়ি, আমার টাকা, আমার বন্ধু, আমার শত্রু। এরাই আমাকে টেনে টেনে নামিয়ে আনছে শুধু। জ্ব'লে পুড়ে ম'রে যাচ্ছি। আমি তোমার কাছে এসেছি শুধু ক্ষমা চাইতে, মুক্তি চাইতে। তোমাকে আমি মারতে এসেছিলাম। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে মুক্তি দাও। আমি পালাই এখান থেকে।

শশিনাথ বললে, তোমার কথাগুলো আমি বুঝতে পারছি না কাশীনাথ। পাগলের মত কি বলছ যা-তা!

কাশীনাথ বললে, বুঝতে পারবে না যে! পৃথিবীর সব ভাল কথাই পাগলের কথা ব'লে মনে হয়। যদি পার তো আমাকে ক্ষমা ক'র। আমি চললাম।

শশিনাথ বললে, কিন্তু তোমার গাড়িটার কি হ'ল? তোমার তো লাগে নি কোথাও?

কাশীনাথ উঠে দাঁড়াল। বললে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটুখানি এগিয়ে যাও। রাস্তার এই মোড়টা পেরুলেই সব দেখতে পাবে, সব বুঝতে পারবে।

শশিনাথের জুতোজোড়াটা ছিল চৌকাঠের ওপারে। জুতো পায়ে দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলে, কাশীনাথ নাই।

শশিনাথ রাস্তায় বেরিয়ে এল। ডাকলে, কাশীনাথ! কাশীনাথ!

কাশীনাথকে দেখতেও পেলে না, তার সাড়াও পেলে না।

শশিনাথ মোড় পেরিয়ে গিয়ে দেখে, কাশীনাথ যা বলেছিল ঠিক তাই। লাল বাড়িটার পাশে কাশীনাথের গাড়িটা কাৎ হয়ে প'ড়ে আছে। গাড়ির সামনের দিকটা ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেছে। জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। কয়েকজন পুলিস কনস্টেবল ভিড় সরাচ্ছে।

ক্রেন্-ফিট্-করা একটা ট্রাক এসেছে। গাড়িটা টেনে নিয়ে যাবে।

ওদিকে পুলিসের গাড়ির কাছে স্ট্রেচারের ওপর একটা মানুষের মৃতদেহ। আপাদমস্তক কাপড় দিয়ে ঢাকা। লোকের ভিড় সেইখানেই বেশী।

লোকজন ধরাধরি ক'রে মৃতদেহটা অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে যাচ্ছিল। শশিনাথ তাড়াতাড়ি সেইখানে গিয়ে দাঁড়াল। থানার ও. সি. শশিনাথের চেনা লোক।

শশিনাথ বললে, গাড়িটা তো কাশীনাথের।

ও-সি. বললেন, এই যে, আপনি এসেছেন? আপনার বন্ধু।

শশিনাথ জিজ্ঞাসা করলে, অ্যাক্সিডেণ্ট কখন হয়েছে?

ও-সি. বললেন, এঁরা তো বলছেন সাতটার সময়। এদিকে উনি যাচ্ছিলেন কোথায়? আপনার বাড়িতেই বোধ হয়।

শশিনাথ কোনও কথা বলতে পারলে না। চুপ ক'রে রইল।

ও-সি. বললেন, পকেটে একটা নতুন চকচকে রিভলভার পাওয়া গেল। লোডেড্ রিভলভার। সাতটা চেম্বারে সাতটা বুলেট।

.মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দেওয়া হ'ল।

ও-সি. বললেন, বন্ধুকে একবার দেখবেন নাকি ?

ব'লেই তিনি এগিয়ে গিয়ে মৃতদেহের মুখের ঢাকা তুলে দিলেন। শশিনাথ দেখলে। মনে হ'ল, কাশীনাথ যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুচ্ছে। মুখে কোথাও এতটুকু বিকৃতির চিহ্ন নেই।

ও-সি. বললেন, চোটটা লেগেছে বুকে। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছেন। আসি। নমস্কার।

গাড়ি চ'লে গেল। শশিনাথ কাঠের মত দাঁড়িয়ে। তার চোখ দুটো তখন জলে ভ'রে এসেছে। এতক্ষণ পরে কাশীনাথের কথাগুলো সে বুঝতে পারলে।—তোমাকে আমি ক্ষমা করেছি কাশীনাথ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

এত বড কলকাতা শহর, কোথাও একখানা ঘর পেলাম না। শেষ পর্যন্ত বস্তির ঘরখানাই নিতে হ'লো। তাও কি দেয় সহজে? আমার মত ফর্সা কাপড়-জামা পরা ভদ্রলোকের ছেলে কেউ থাকে না সেখানে। বাড়ীউলি কুমু একটু হেসে বললে, দেখো বাবু, তোমাকে রেখে শেষে আমাকে না বিপদে পড়তে হয়!

কুমু গয়লার মেয়ে। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। ধপধপে গায়ের রং। বাঁধানো দাঁত। চোখে নিকেলের চশমা। পরমাসুন্দরী এক অবিবাহিতা নাতনী আর একজন কর্মচারী নিয়ে তার সংসার। খান্ চার পাঁচ ঘর আর খানিকটে উঠোন নিয়ে তার নিজের এলাকা সে পৃথক করে' নিয়েছে। তারই এপাশে ওপাশে সারি সারি ঘর, ভাড়ায় বসানো।

আমার পাশের ঘরে থাকে একটি আধবয়েসী মেয়ে। দিনরাত শুনি বকছে। মানুষ যে এত বকতে পারে এর আগে সে কথা আমার জানা ছিল না।

চেহারা দেখে বুঝতে পারি না, কিন্তু বকুনি শুনে মনে হয়—মেয়েটা ছোটজাতের মেয়ে।

আর একটা বিরক্তিকর ব্যাপার আছে এখানে। সেটা হচ্ছে—ধোঁয়া।

শীতকাল। ভোর বেলাটা লেপ মুড়ি দিয়ে চুপ করে' শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু থাকবার উপায় নেই। ধোঁয়ার চোটে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হয়।

উনোন কি একটি দুটি?

যে মেয়েটার কথা বললাম, তার একটা ছেলে আছে ষোলো সতেরো বছরের। ছেলেটা কোথায় যেন বিড়ি বাঁধতে যায়।

তা সে চা না খেয়ে কিছুতেই বেরুবে না।

সাত সকালে মাকে তাই বকতে বকতে উনোন ধরাতে হয়। ওদিকে রামরসিকের চালার চুল্লিতে তখন আগুন পড়েছে। বিরাট উনোনে ইঞ্জিনের মত ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওই উনোনে কড়াই চাপবে। সেই কড়াইএ তৈরি হবে

তেলের জিলিপি। ডালা ভর্তি সেই জিলিপি রামরসিক বিক্রি ক'রে আসবে চটকলের একটা দোকানে।

তার পাশেই থাকে হরমন্ পাশী।

এককালে পাশী ছিল। খেজুর গাছ কামিয়ে তার রস চালান দিত শহরের তাড়িখানায়। এখন আর পাশীর কাজ করে না। এখন—হরমন্ চা-ওয়ালা।

তারও উনোনে ধোঁয়া উঠছে। ওই উনোনে জল গরম হবে। তারপর সেই গরম জলে হরমনের নিজের আবিষ্কৃত এক অভিনব পন্থায় তৈরি হবে একরকম তরল পদার্থ। তার নাম—চা। পেতলের নল-বসানো একটা কলসীতে ভরা হবে সেই চা। ছোট্ট একটা তোলা উনুন আছে হরমনের। কাঠ-কয়লার উনোন। সেই জ্বলন্ত উনোনের সঙ্গে লোহার তার দিয়ে আট্‌কাতে হবে সেই চায়ের কলসী।

হরমন নিজের হাতে করে না এ-সব কাজ।

এ-সব করবার জন্যে হরমনের আছে এক অষ্টাদশী কন্যা—চুম্‌কি। যেমন চেহারা তার তেমনি স্বাস্থ্য। আঁট্‌সাট্ গড়ন। গাছ-কোমর বেঁধে কাপড় পরে, টাইট বডি গায়ে দেয়। সাদা ধবধবে দাঁত, ঢলঢল দুটি চোখ, আর কালো ভ্রমরের মত একপিঠ কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল।

কানা-উঁচু ঝকেঝকে পিতলের থালায় একথালা ছাতু খেয়ে ঘটির জলে হাত ধুয়ে হরমন উঠে দাঁড়াবার আগেই চুম্‌কি তার চায়ের কলসী ঠিক করে দেয়।

উনোন-সমেত কলসীটা একহাতে ঝুলিয়ে হরমন আর এক হাতে নেয় মাটির ভাঁড়-ভর্তি একটা ঝোলা, তারপর মুঙ্গেরী নাগরা জুতো পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে বস্তি থেকে। মুখে বলে, সিয়ারাম! সিয়ারাম!

এই দৃশ্য আমি রোজই দেখি।

রোজই এক, কিন্তু একঘেয়ে নয়।

একঘেয়ে অনায়াসে হতে পারতো, কিন্তু একঘেয়েমিটা কাটিয়ে দেয় বিহারী মিস্ত্রী।

ওদিকের একটা ঘর নিয়ে একাই থাকে বিহারী। বিহারী মোটর ড্রাইভার।

বিহারীর সঙ্গেই আমার প্রথম পরিচয়। যে-হোটেলে আমি খেতে যাই সেই হোটেলে দেখি বিহারী খাচ্ছে।

—কি খবর দাদাঠাকুর!

বললাম, খেতে এসেছি।

বলেই বসতে হ'লো তারই পাশে।

বিহারী অনর্গল কথা বলে যেতে লাগলো। বললে, আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমরা নচ্ছার বজ্জাত মানুষ, আমরা থাকতে পারি বলে' কি আপনি পারবেন ওই বস্তিতে থাকতে?

বললাম, কেন? আমাকে দেখে কি নচ্ছার বজ্জাত বলে মনে হচ্ছে না?

বিহারী হাসলে। হেসে বললে, মানুষ চরিয়ে খাই। মানুষের মুখ দেখেই চিনতে পারি আমরা।

তারপর সে বলতে আরম্ভ করলে, কোথায় কতবার কিরকম করে মানুষ চরিয়েছে। মুখ দেখে মানুষ চেনার বিচিত্র এবং রোমাঞ্চকর কাহিনী।

অনেকক্ষণ বকে আর বকিয়ে বিহারী উঠে গেল। ভাবলাম, ঠিকই বলেছে লোকটি। এই সব মানুষের সঙ্গে বাস করা হয়ত-বা বেশি দিন চলবে না।

পথে কোনও পরিচিত মানুষের সঙ্গে দেখা হ'লে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কোথায় থাকি জিজ্ঞাসা করলে তাকে আমার ঠিকানা বলি না। লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের মত যে ক'দিন থাকতে পারি দেখা যাক্।

ভবানীপুরের একটি বোর্ডিং হাউসে আমার এক বন্ধু থাকে। বলেছিল, মাস দুই পরে সে চলে যাবে সেখান থেকে। কথা ছিল যাবার আগে তার জায়গাটা আমাকে দিয়ে যাবে। তাই মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে যাই।

আর যাই বৌবাজারে। সেখানে থাকে আমার আর এক বন্ধু। মস্ত বড় একখানা ঘর সে একা দখল করে' আছে। বহু মূল্যবান কতকগুলি বই আর একটি টাইপ রাইটার মেসিন আমি রেখেছি তার কাছে। বলেছি ভাল জায়গা একটা পেলেই আমি এই জিনিসগুলি নিয়ে যাব।

বস্তির পাশে রাস্তার ধারে একটিমাত্র জলের কল। অতি প্রত্যূষে উঠে আমাকে এই কলের প্রয়োজনটা সেরে ফেলতে হয়। নইলে কল আর ফাঁকা পাওয়া যায় না। সেদিন একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। কলের চারিদিকে মেয়েরা গিয়ে জড়ো হয়েছে। গামছাটা কাঁধে ফেলে বালতি হাতে নিয়ে ক্রমাগত ঘর-বার করছি, এমন সময় বাড়িউলী কুমুর সুন্দরী নাম্নী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো, বললে, দিদি আপনাকে ডাকছেন।

বললাম, স্নানটা করেই যাচ্ছি।

মেয়েটি বললে, না। আপনি এক্ষুণি আসুন।

—এই অবস্থায়?

মেয়েটি হাসলে। বললে, হ্যাঁ, অমনি বালতি হাতে নিয়ে, গামছা কাঁধে ফেলে।

গেলাম। কুমু দাঁড়িয়েছিল আমারই অপেক্ষায়। যাবামাত্র বললে, ওখানে চান করতে তুমি পারবে না বাবা, তুমি আমার এইখানে চান করবে। চঞ্চলা, কলতলাটা দেখিয়ে দে।

উঠোনের একপাশে স্নানের ঘর। টিন দিয়ে ঘেরা। চঞ্চলা আগে আগে গিয়ে টিনের দরজাটি খুলে দিয়ে বললে, ওইখানে সাবান আছে, তেল আছে। আপনি মাখতে পারেন।

দেখলাম সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো চমৎকার স্নানের ঘর। চঞ্চলা আবার হাসলে। হেসে বললে, সাবানটা নতুন। মাথা সাবান নয়। বলেই সে তেমনি হাসতে হাসতে টিনের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল।

স্নান করে ফিরে এসেই দেখি, আমার ঘরের সুমুখে বসে আছে বিহারী। বসে বসে বিড়ি টানছে।

কি খবর বিহারী?

বিহারী বললে, কাপড় জামা পরুন, বলছি।

বিড়িটা ফেলে দিয়ে বিহারী ঘরে ঢুকলো। বললে, ভুল বলেছিলাম দাদাঠাকুর।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভুল বলেছিলে?

বলেছিলাম, আপনি এখানে থাকতে পারবেন না। এখন দেখছি পারবেন।—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, বলবেন?

—কি কথা, বল।

—ওর সঙ্গে কতদিনের আলাপ আপনার?

—কার সঙ্গে?

বিহারী হাত দুটি জোড় করে' বললে, কেন আর ছলনা করছেন প্রভু! ওই যে ওই মেয়েটির সঙ্গে!

বললাম, ওর সঙ্গে পরিচয়—এখনও একঘণ্টা পার হয়নি। বিহারী বলে উঠলো, বললেই শুনবো? আমি বিহারী মেকানিক, আমি হচ্ছি গিয়ে মোটর

গাড়ী আর মেয়েমানুষ সম্বন্ধে—আপনারা কি বলেন যে ছাই—ইস্‌পেসেলিস্ট আমি সব দেখেছি। চঞ্চলার ও-হাসি একদিন-চেনার হাসি নয় দাদাঠাকুর। যত বলি তুমি বিশ্বাস কর, ততই বিহারী বেঁকে বসে।

বলতে বাধ্য হলাম শেষে—তাতে হয়েছে কি?

বিহারী বললে, কিছু না। এই তো চাই! এ না হ'লে এই শালা লঝ্‌ঝড় তুনিয়ায় বাঁচবেন কি সুখে? ওই-রকম একটি সুন্দরী মেয়ে ভালবাসবে, কাছে আসবে, হাসবে, তুটো কথা বলবে, তবে তো কাজকর্ম করতে মনে জোর পাবেন! চালিয়ে যান, চালিয়ে যান। বিপদে আপদে শুধু স্মরণ করবেন এই অধমকে। বাস্‌, আর কিছু না। চলি।

বিহারী উঠে গেল। বাঁচলাম। একটু দেরী করে হোটেলে যাব ভাবছি। বিহারীর সঙ্গে আবার সেখানে দেখা হয়ে গেলে আবার সেই একই কথা তুলে বসবে।

আজ আর কাজে বেরুবো না। দালালীর কাজ। সবদিন যেতেও হয় না। একখানা বই নিয়ে পড়তে বসলাম। এমন সময় দেখি বিহারী আবার ফিরে এলো।

হাসতে হাসতে বিহারী বললে, আবার ফিরে এলাম দাদাঠাকুর।

কথাটাকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেবার জন্য বললাম, তুমি আজকাল কি কাজ কর বিহারী? কাজে তো যেতে দেখি না।

বিহারী বললে, একা মানুষ, আমার যখন দরকার হয় তখন কাজ করি। প্রাইভেট গাড়ী চালাই, ট্যাক্সি চালাই, ট্রাক চালাই, আবার কখনও কখনও কারখানায় গিয়ে মেকানিকের কাজ করি। আমার বাঁধা চাকরি আপনার বাবা-ঠাকুদার আশীর্বাদে।

এবার কি বলবো তাই ভাবছি, বিহারী নিজেই বললে, আপনাকে একটা খুব প্রাইভেট কথা বলবো যে দাদাঠাকুর।

বুঝলাম, বলতে যখন সে এসেছে তখন না বলে ছাড়বে না। বললাম, বল।

বিহারী আমার খুব কাছে এসে বসলো। বললে, আচ্ছা দাদাঠাকুর, আমার চেহারাটা কি খুব খারাপ?

বললাম, না না খারাপ কেন হবে?

ঘন ঘন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বিহারী বলল, এ আমার মন-রাখা কথা দাদাঠাকুর, আমি বুঝতে পারি। আমার চেহারা নিশ্চয়ই খারাপ, নইলে

আজ পর্যন্ত এমন একটা মেয়ে পেলাম না কেন—যে আমাকে ভালবাসতে পারে ?

—কেউ তোমাকে ভালবাসেনি ?

—না।

—বিয়ে করনি ?

বিহারী বললে, দুবার করেছিলাম। একটা মরে গেল, আর একটা গেল পালিয়ে।

এই বলে সে থামলে। কি যেন ভাবলে। তারপর বললে, গুলি মারো ! বিয়ে আবার মানুষে করে ! আপনি বিয়ে করেছেন ?

বললাম, না।

মুখখানা দেখে মনে হলো বিহারী খুব খুশী হয়েছে। বললে, দেখুন কি রকম মিলে গেছে আমাদের দু'জনের। বিয়ে করবেন না।

বললাম, যাকে ভালবাসবো, তাকেও বিয়ে করবো না ?

বিহারী বললে, না দাদাঠাকুর, বিয়ে করলেই দেখবেন—ভালবাসা-টালোবাসা সব উড়ে গেছে। যাক্‌গে, আমি মুখখু-সুগখু মানুষ, ও সব বোঝাতে পারবো না আপনাকে। যে কথাটা বলতে এসেছি, সেই কথাটা বলি। হরমনকে চেনেন তো ?—ওই ব্যাটা হরমন পাশীকে ?

—চিনি।

—ওর মেয়ে চুম্‌কিকে দেখেছেন ?

বললাম, দেখেছি।

বিহারীর মুখখানা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললে, কেমন মেয়ে ? ভাল না ?

বললাম, খুব ভাল।

বিহারী চুপিচুপি বললে, ওই ওকে আমি ভালবাসি।

খুব ভাল কথা। বললাম, তুমি বাঙালী, ওরা হিন্দুস্থানী, ওর ভাষা তুমি বুঝতে পারো ?

বিহারী বললে, হাসালেন দাদাঠাকুর, প্রেম যেখানে, সেখানে আবার ভাষা কিসের ! শুনুন দাদাঠাকুর, আপনাকে একটি কাজ করতে হবে। হরমনের ইচ্ছে নয় যে, আমি ওর মেয়ের সঙ্গে প্রেম করি। ও-ব্যাটা প্রেমের বোঝেই-বা কি ! তা আপনাকে ও-ব্যাটা ভক্তি শ্রদ্ধা করে আমি দেখেছি। আপনাকে

দেখলেই ব্যাটা পেন্নাম করে, বলে গোড়্ লাগি মহারাজ! আপনি যদি কায়দা মাফিক্ আমার কথাটা ওকে ভাল করে' বলে দেন তো আমি আপনার গোলাম হয়ে থাকবো দাদাঠাকুর।

বিহারী আমাকে ভেবেছে কি? আমাকে ঘটকালি করতে হবে? বললাম, তোমাদের প্রেমই যদি হলো তো বলে দিতে হবে কেন?

বিহারী বললে, আয়ান ঘোষের নাম শুনেছেন? কেষ্ট রাধিকার প্রেমের মাঝখানে যেমন বাধা হয়েছিল আয়ান ঘোষ, এখানেও তেমনি আমাদের দু'জনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওই ব্যাটা হরমন।

এই বলে সে তার নিজের রসিকতায় নিজেই মশগুল্ হয়ে হো হো করে হাসতে লাগলো।

পরের দিন সকালে ভগবান আমাকে রক্ষা করলেন। চুম্‌কির সঙ্গে বিহারীর পবিত্র প্রেমের পথটিকে নিষ্কণ্টক করে' দেবার যে ভার আমি পেয়েছিলাম, সে-ভার আমাকে আর বহন করতে হলো না।

সকালে ঘুম ভাঙলো বস্তির ভেতর একটা গোলমাল শুনে। দোর খুলে বেরিয়ে আসতেই দেখি চীৎকার করছে হরমন। কি ব্যাপার জানবার জন্য হরমনের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় দেখলাম হরমনই ছুটে আসছে আমার কাছে। এসেই সে আমাকে প্রণাম করে' যা বললে তার মর্মার্থ এই যে, আপনাদের ওই ব্যাটা বেহারীকে আমি যদি খুন করে' ফেলি তো আপনারা তখন যেন আমাকে কিছু বলবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেছে সে?

হরমন বললে, সে কথা বলতে গেলে নিজেরই লজ্জায় মাথা কাটা যায় বাবু, আমাকে চা নিয়ে বেরুতে হবে এক্ষুনি, নইলে সব কথা আপনাকে খুলে বলতাম। এখন শুধু এইটুকু শুনে রাখুন বাবু, আমার মেয়ে চুম্‌কিকে সে একটা শাড়ি দিতে এসেছিল, আর একদিন—যাক্‌গে, বুঝতেই তো পারছেন···

আমি তাকে অনেক কষ্টে থামিয়ে দিলাম। বললাম, যাও, তুমি চা নিয়ে চলে যাও। আমি বিহারীকে বলছি—আর সে কখনও ওরকম করবে না। তোমার চুম্‌কিকেও আমি কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করব।

আসুন বাবু। বলে সে আমাকে চুম্‌কির কাছে নিয়ে গেল। চুম্‌কি তখন তার বাবার চায়ের কলসীটা লোহার তার দিয়ে উনুনের সঙ্গে বাঁধছিল।

হরমন আগে গিয়ে তার মেয়েকে কি যেন বললে। চুম্‌কি আমার দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি একটু হাসলে। হেসেই ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

বুঝলাম, হরমন আমারই সম্বন্ধে তাকে কিছু বলছে।

চুম্‌কি দড়ির একটা চৌকি হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। চৌকিটা পেতে দিয়ে বললে, বসুন।

বসলাম। বসেই জিজ্ঞাসা করলাম, বাংলা কথা বুঝতে পারো?

চুম্‌কি আবার হাসলে। হেসে বললে, বোল্‌তে ভি পারি। কথাটা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা করছিল, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, কি করেছে বিহারী?

চুম্‌কির মুখখানা হঠাৎ অন্যরকম হয়ে গেল। বললে, এক থাপ্পড় মেরেছি আমি ওকে। এবার যদি কিছু বলে তো ওর দাঁত ভেঙ্গে দেবো।

আর কিছু বলবার দরকার নেই। হরমনকে একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি বললাম, মেয়ের বিয়ে দেবে না?

হরমনের কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম। সে তার নাকে কানে হাত দিয়ে জিব বের করে বললে, ও কথা বলবেন না বাবু, ও বিধবা। ওর সাদি আমি দিয়েছিলাম—ওর উমের ত'ন পাঁচ বরষ।

এর ওপর আর কথা চলে না। দেখলাম বিহারীর ঘরের দরজা বন্ধ। বোধ করি সে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি; নয়তো ঘরের ভেতর খিল বন্ধ করে' বসে আছে। হরমনকে বললাম, যাও তুমি কাজে চলে যাও, তোমার দেরী হচ্ছে। আমি দেখছি।

আমার নিজের ঘরে ফিরে এসেই দেখি দোরের কাছে চঞ্চলা দাঁড়িয়ে।—কিছু বলছো?

চঞ্চলা বললে, চান করবেন না?

বললাম, করবো। একটু পরে।

চঞ্চলা বললে, কলের জল চলে যাবে।

বললাম, যাক না। চৌবাচ্চা তো আছে!

চঞ্চলা বললে, চৌবাচ্চার বাসি জলে চান করলে অসুখ করে।

বললাম, আমাদের কিছু হয় না। অভ্যেস আছে।

চঞ্চলা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো বাইরে। ভাবলাম চলে গেছে।

তখনও আমার দাঁত মাজা হয়নি। তারই ব্যবস্থা করছি, পেছনে খুট করে' শব্দ হতেই ফিরে দেখি চঞ্চলা ঘরে ঢুকছে। আমার বালতি, গামছা,

তোয়ালে তুলে নিয়ে বললে টুথ্‌পেষ্ট ওখানেও ছিল। থাক, আপনার নিজেরটাই নিয়ে আসুন। এ-সব আমি নিয়ে যাচ্ছি।

বাধ্য হয়ে যেতে হলো।

স্নানের ঘরে বালতি গামছা নামিয়ে চঞ্চলা আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

—হাসছো যে?

হাসি বন্ধ করে চঞ্চলা বললে, বিহারীর হাত দিয়ে শাড়ীটা কি আপনিই পাঠিয়েছিলেন?

সর্বনাশ! এ বলে কি?

চঞ্চলা বললে, বেচারী মার খেলে শুধু-শুধু।

—সবই তুমি জানো দেখছি।

—বস্তির সবাই জানে।

বললাম, ওই কথাটা কিন্তু এখনও কেউ জানে না।

চঞ্চলা জিজ্ঞাসা করলে, কোন কথাটা?

বললাম, শাড়ীটা আমিই পাঠিয়েছিলাম বিহারীর হাত দিয়ে।

—তা না তো কি? বিহারী তো আপনার বন্ধু।

—হ্যাঁ। কথাটা তুমিই জানলে। আর কাউকে জানিয়ো না যেন।

চঞ্চলা বললে, বিহারী মদ খায়।

বললাম, ধরে নাও আমিও খাই। বন্ধু যখন—

কথাটা চঞ্চলা শেষ করতে দিলে না।

বন্ধুত্ব করবার আর লোক পেলে না!—বলেই সজোরে টিনের দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে চঞ্চলা ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

স্নান করে এসে কাপড় জামা পরছি, চুপি চুপি চোরের মত ঘরে এসে ঢুকলো বিহারী। এসেই বললে, ব্যাটা, চলে গেছে। ঘরে খিল বন্ধ করে বসেছিলাম দাদাঠাকুর। বিহারীকে তিরস্কার করবো ভেবেছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, এই তোমার প্রেম বিহারী?

বিহারী বললে, প্রেম তো এক রকমের হয় না দাদাঠাকুর। একটা চড় মেরেছে তো হয়েছে কি?

বললাম, চুম্‌কি কিন্তু তোমাকে চায় না বিহারী। কেন তুমি মিছেমিছি ওকে বিরক্ত করছো বলতে পারো?

বিহারী বললে, বিরক্ত ? হ্যাঁ কাল আমি ওকে একটু বিরক্তই করেছি। কেন করেছি জানেন দাদাঠাকুর ? কাল একটু ড্রিঙ্ক করেছিলাম। তাই মাথা ঠিক ছিল না। আমি ড্রিঙ্ক করার জন্যেই চুম্‌কি আমাকে চড় মেরেছে, তা না হ'লে মারতো না।

ছি ছি, বিহারী ড্রিঙ্ক করে! লোকটা মাতাল, দুশ্চরিত্র। চঞ্চলা ঠিকই বলেছে। ওর সঙ্গে কথা বলাও অন্যায়। বললাম, তাহ'লে তুমি যা ভাল বোঝো তাই কর। এর মধ্যে আমাকে টেনো না।

বিহারী জিজ্ঞাসা করলে, ওর বাবা যে আপনাকে ডেকে নিয়ে গেল, কি বললে ?

—তুমি সে কথা জানলে কেমন করে ?

—জানালার ফুটো দিয়ে দেখেছি তো সব।

বললাম, যা বলা উচিত তাই বললে। হরমন বললে, ফের যদি কোনদিন দেখি বিহারী আবার মেয়েকে বিরক্ত করছে তাহ'লে ওকে আমি খুন করে ফেলবো।

বিহারী হাসতে লাগলো। বললে, খুন করবে আমাকে! এ জন্মে পারবে না। আমি একসময় ভেবেছিলাম, মোটরকার একটি দাঁড় করিয়ে রাখবো ওইখানে ওই রাস্তার ধারে, তারপর অন্ধকারে চুম্‌কির মুখে কাপড় চাপা দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে তুলবো সেই গাড়ীতে। তারপর বাস। গাড়ী উড়িয়ে দেবো যেখানে আমার খুশী। ওই ওর বাপটা কষ্ট পাবে বলে সে কাজটা আর করিনি।

বললাম, তুমি যাও বিহারী আমার একটা কাজ আছে।

—তাড়িয়ে দিচ্ছেন দাদাঠাকুর ?

—হ্যাঁ। তাড়িয়েই দিচ্ছি।

বিহারী চলে গেল। ভাবলাম চলেই যাব এখান থেকে। চঞ্চলা মেয়েটিকে আমার মন্দ লাগছে না। কিন্তু সে গোয়ালার মেয়ে। আমি ব্রাহ্মণ। আমার মনের মধ্যে যদিও কোনও সংস্কার নেই, আমাকে বাধা দেবারও কেউ নেই, তবু একে আর বাড়তে দেওয়া ভাল মনে হয় না।

হ্যাঁ চলেই যাব আমি এখান থেকে।

চলে যাবার সুযোগটাও যে এত তাড়াতাড়ি মিলবে তা ভাবিনি।

ভবানীপুরের যে বন্ধুটি আমাকে তার ঘরখানি ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে

বলেছিল, তার সঙ্গে দেখা করতেই সে বললে, তিন চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ে গেছে ভাই, গোটা পঞ্চাশেক টাকা যদি আমাকে ধার দিতে পারো, যেদিন দেবে, আমি তার পরের দিনই চলে যাব।

পঞ্চাশটি টাকা আমার সঙ্গেই ছিল। এ টাকা দিলে অবশ্য আমার কাছে আর বিশেষ কিছুই থাকবে না। তা না থাক্, বন্ধুকে দিলাম পঞ্চাশটি টাকা।

বন্ধু বললে, কাল—না কাল নয়, পরশু তুমি একেবার তৈরি হয়ে চলে এসো। আমি সব ঠিক করে রাখবো।

তৈরি হয়ে আসা আমার পক্ষে যত সহজ ভেবেছিলাম আসবার সময় ঠিক তত সহজ বলে মনে হল না। লুকিয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। চঞ্চলাকে বলে যেতে পারলাম না। চৌকি একটা কিনেছিলুম সেটা তেমনি পড়ে রইলো। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে একটা হোল্ডল, বড় একটা ক্যানভাসের ব্যাগ আর বালতিটি নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম।

চঞ্চলা হয়ত কাল সকালে ডাকতে আসবে স্নান করবার জন্যে। বিহারীও আসতে পারে।

আসুক্।

জীবনে এমন কত আসে, কত যায়। এর জন্যে দুঃখ করা উচিত নয়।

ভবানীপুর আর কতক্ষণ!

ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে অতিকষ্টে জিনিসপত্র টানতে টানতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গিয়ে ডাকলাম বন্ধুকে।

দোর খুলে বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে।—কাকে চান?

মেয়েটিকে দেখে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বললাম, নগেনকে ডেকে দিন।

মেয়েটি বললে, নগেন বলে কেউ তো নেই এখানে।

ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠলো—নগেনবাবু এখান থেকে চলে গেছেন, বলে দাও।

বললাম, আপনি একবার বাইরে আসবেন দয়া করে?

বেরিয়ে এলেন এক অপরিচিত ভদ্রলোক। এসেই বললেন, নগেনবাবু চলে গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কে?

—আমি এ বাড়ী ভাড়া নিয়েছি। নগেনবাবু আমাকে দিয়ে গেছেন।

বললাম, কিন্তু সে যে আমাকে আসতে বলেছিল।

তিনি বললেন, সে তো অনেককেই বলেছিল। আপনার মত ভাড়া নেবার লোক তো আরও দু'জন ফিরে গেল। একজন তো ঘোড়ায় গাড়ী করে মালপত্র মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। সত্যমিথ্যে জানি না মশাই, সে ভদ্রলোক তো এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত হাঙ্গামা বাধিয়েছিলেন। বলছিলেন, নগেনবাবু তার কাছ থেকে দেড় শ' টাকা নিয়েছেন। আপনিও কিছু দিয়েছিলেন নাকি?

মাথার ভেতরটা কেমন যেন করছিল। জবাব দিতে পারলাম না।

তিনি বললেন, আমি কিন্তু মশাই কাঁচা কাজ করিনি। নগদ একশটি টাকা নগেনবাবুর হাতে দিয়ে বাড়ীর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে সব ঠিকঠাক করে আগে এসে উঠেছি, তারপর নগেনবাবু গেছেন এখান থেকে।

বললাম, সে জোচ্চোরটা কোথায় গেছে বলতে পারেন?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, এরকম যারা করে তারা তো ঠিকানা রেখে যায় না। বুঝতেই পারছেন।

এই বলে' একটি নমস্কার করে দোরটা তিনি বন্ধ করে দিলেন।

নগেন আমার বন্ধু। পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আমার সঙ্গে প্রতারণা করতেও কুণ্ঠিত হলো না।

নগেন শিক্ষিত। নগেন ভদ্রলোক।

আবার সেই বস্তি।

চোরের মত চুপিচুপি ঘরে এসে ঢুকলাম। কেউ কিছু জানে না বলেই মনে হলো।

যাবার সময় বিহারীকে দেখতে পাইনি! সারাদিন তার ঘরের দরজা বন্ধই ছিল।

আবার আলো জ্বালালাম। আবার বিছানা পাতলাম।

—দাদাঠাকুর!

এই রে! আবার বিহারী।

বিহারী ঘরে ঢুকলো। পরনে খাঁকি ফুল প্যান্ট, গায়ে হাত কাটা খাঁকি সার্ট। হাতে একটা কাপড় জড়ানো ছোট বাক্স।

ঘরে ঢুকেই বিহারী দোরের খিলটা বন্ধ করে দিলে। বললাম, দরজা বন্ধ করলে কেন?

—আছে কাজ।

বিহারী আমার পাশে এসে বসলো। বললে, একটা কাগজ কলম নিয়ে বসুন দাদাঠাকুর। খুব একটা জরুরী কথা আছে।

ছ্যাখো আবার কি হুকুম হবে! কাগজ কলম নিয়ে বসবো আর হয়ত' বলবে—তার কোনও প্রণয়িণীকে একখানি চিঠি লিখে দিতে। ইতস্তত করছিলাম। বিহারী নিজেই আমার লিখবার প্যাডখানা এনে হাতের কাছে দিয়ে বললে, কলমটা বের করুন দাদাঠাকুর।

কলম নিয়ে বসলাম।—বল কি লিখতে হবে।

বিহারী বললে, একটা বিজ্ঞাপন দিতে হবে বাংলা খবরের কাগজে। বিকেল পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার ভেতর বালিগঞ্জ এলাকায় বহুমূল্য একটি গহনার বাক্স আমার ট্যাক্সিতে যিনি ফেলে গেছেন তিনি গহনার ঠিক ঠিক বর্ণনা দিয়ে আমার কাছ থেকে সে বাক্সটি নিয়ে যেতে পারেন।

—গহনার বাক্স?

কাপড়ে জড়ানো বাক্সটি খুলে বিহারী দেখালে, নববিবাহিতা কোনও ধনীকন্যার গিনিসোনার বহু অলঙ্কার।

বললে, কোন্ বাড়ীতে নেমে গেল ঠিক মনে করতে পারছি না দাদা-ঠাকুর। তখন আমি দেখতেও পাইনি, নইলে তক্ষুণি দিয়ে দিতাম।

বিহারীর মুখের পানে তাকালাম। অশিক্ষিত মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র বিহারী!

বললাম, নিজে টাকা খরচ করে বিজ্ঞাপন না দিয়ে কোনও পুলিশ থানায় জমা দিয়ে দিলেই পারতে।

বিহারী বললে, না দাদাঠাকুর, কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না আজকাল। বিজ্ঞাপনে কিছু পয়সা যেমন খরচ করবো তেমনি যার হারিয়েছে সে যখন ফিরে পাবে, আমাকে কি রকম আশীর্বাদ করবে বলুন দেখি!

—আশীর্বাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের টাকাও তুমি ফিরে পাবে।

বিহারী বললে, না পেলেও ক্ষতি নেই দাদাঠাকুর। ফিরিয়ে দিতে পারলে যে আনন্দটুকু আমি পাব তার দাম অনেক। তবে অনেক ঝামেলা সইতে হবে দাদাঠাকুর। বিজ্ঞাপন দেখে কত বাজে লোক আসবে দেখবেন। তাদের তাড়াতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এর আগেও এরকম তুমি পেয়েছো নাকি?

বিহারী বললে, কতবার পেয়েছি ঠিক মনে করতে পারছি না। ছাতা ছড়ি সুটকেশ, কলম, পেন্সিল, রুমাল, মণিব্যাগ—কত পেয়েছি। সব কি আর ফেরৎ দিতে পেরেছি বাবু? কার জিনিস কোনও হদিশই পাওয়া যায় নি—এমনও হয়েছে। একবার হয়েছে কি শুনুন তবে। তখন সবে লাইসেন্স পেয়েছি। ট্যাক্সি চালাই। যার ট্যাক্সি সে সঙ্গে থাকে, পয়সা কিছুতেই দিতে চায় না। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটায়। ক্ষিদে পেলে খেতে পাই না। এমন দিনে একটি মণিব্যাগ পেলাম। খুলে দেখি, একশ টাকার তিনখানি নোট, আর গণ্ডাচারেক পয়সা। বিড়ি সিগারেট খেতে ধরেছি। অথচ ভাল একটা সিগারেট খাবার পয়সা জোটে না। সেই চার আনার সিগারেট কিনে ফেললাম। আর তিনশ' টাকা ভাবলাম মেরে দিই! মনিবের সঙ্গে একদিন বচসা হতেই দিলাম চাকরিটা ছেড়ে। চাকরি ছেড়ে বসে আছি। ভাবছি টাকা রয়েছে সঙ্গে, ভাবনা কি? একা মানুষ, অনেকদিন চলবে। কিন্তু সে নোট আর ভাঙ্গাতে পারি না কিছুতেই! হোটেলে খাই, একমাস হয়ে গেল, টাকা চায়, নোট একটা বের করে দিতে গিয়েও দিতে পারি না। খালি খালি মনে হয়—এ তো চুরি! ছি, ছি. এ আমি কি করলাম? দিনে স্বস্তি নেই, রাত্রে ঘুম নেই! হঠাৎ একটা প্রাইভেট গাড়ী চালাবার চাকরি পেয়ে গেলাম। তখন আর সে নোট ভাঙ্গাবার প্রয়োজন হলো না। গেলাম পুলিশ থানায়। একেবারে লালবাজারে। সেখানে গিয়ে জমা দিয়ে এলাম সেই মণিব্যাগসমেত একশ' টাকার তিনখানি নোট। বাস্, নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম। তারা যা খুশী তাই করুক। তাদের ধর্ম তাদের কাছে। না কি বলেন দাদা-ঠাকুর! ভাল কাজ করিনি?

বললাম, হ্যাঁ, ভাল কাজ করেছো।

বিহারী কিন্তু সেখানেও থামলো না। আবার আর একটি গল্প বললে।

বললে, আর একটা খুব মজার কথা শুনুন বাবু। তখন একটা ট্যাক্সি চালাই। ট্যাক্সিতে সব সময়েই আমার পাশে বসে থাকে মণিবের ভাইপো। প্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করে নিজের পকেটে রাখে। টাকা পয়সা আমাকে ছুঁতে দেয় না। একদিন এক ভদ্রলোককে নামিয়ে দিলাম তাঁর বাড়ীর দরজায়। দেখা গেল, তিনি একটা রুমালে বাঁধা পোঁটলা ফেলে গেলেন! মালিকের ভাইপোর নাম ছিল করুণা। টপ্ করে' পেছনের

সিটে গিয়ে বসলো সে। বসেই বললে, চালাও। আমি তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ একবার পেছন ফিরে দেখি না সে একতাড়া নোট গুনছে। বললাম, ভদ্রলোক ফেলে গেলেন বুঝি? করুণা বললে, তোমার ও-সব জানবার দরকার নেই। তুমি যা করছো তাই করো। গাড়ী চলছিল সেণ্ট্রল্ এ্যাভিনিউ ধরে! করুণা ডানদিকে যেতে বললে। তারপর বড় রাস্তা ছেড়ে গলিতে ঢুকলো। এ-রাস্তা সে রাস্তা ধরে শেষে একটা ছোট্ট চায়ের দোকানের কাছে এসে বললে, থামাও, চা খাব। গাড়ীতে বসেই চায়ের অর্ডার দিলে। দু' কাপ। আমিও খেলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, কত?

করুণা প্রথমে বলতে চাইলে না।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম। তখন বললে, সাত হাজার।

বললাম, চলুন ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

করুণা চীৎকার করে উঠলো, সাট্ আপ্ ইউ ফুল!

চুপ করে' গেলাম। বললে, চালাও বেলেঘাটা।

বেলেঘাটায় বাড়ী তাদের। বললাম, কাকাকে দেবে টাকাগুলো?

করুণা বললে, না। কাউকে কিচ্ছু বলবে না। তোমাকে দিচ্ছি তিনশ' টাকা। এক্ষুণি দিচ্ছি নাও।

বললাম, না। আমি চাই না।

করুণা ভাবলে, আমি রাগ করে' বলছি। বললে, আচ্ছা আরও দু'শ দিচ্ছি। পাঁচ'শ টাকা। এর বেশি আর একটি পয়সাও দেবো না। গাড়ীতে যা থাকবে, তা আমাদের প্রপার্টি। তোমাকে দিচ্ছি দয়া করে। নেবে নাও, না নেবে, নিও না।

তারপর আপন মনেই গজ্‌গজ্ করতে লাগলো: বলে দেবে? বল না যাকে খুশী। আমার কিস্‌সু করতে পারবে না। কে দেখেছে নিতে? সাক্ষী কে?

গাড়ী এসে দাঁড়ালো তাদের বাড়ীর দরজায়।

করুণা বললে, এখন বলছি ভালয়-ভালয় নেবে তো নাও পাঁচশ' টাকা। একসঙ্গে পাঁচশ' টাকা জীবনে দেখতে পাবে না। যা পাচ্ছ নিয়ে নাও। চুপ করে রইলে যে? নেবে না?

বললাম, না। আমার ভয় করে। ও-টাকা ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।

ভেংচি কেটে করুণা বললে, ফিরিয়ে দেওয়া উচিত! ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির! বয়ে গেল। নিয়ো না।

টাকা নিয়ে করুণা নেমে গেল গাড়ী থেকে। খানিক্ পরে ফিরে এসে বললে, চালাও। টাকাগুলো বোধ হয় বাড়ীতে রেখে এলো। বললে, তোমার পাঁচশ' টাকা আমি নিয়ে এসেছি। এখনও নেবে তো নাও, পরে চাইলে কিন্তু আর পাবে না।

টাকা যখন সে ফিরিয়ে দেবেই না, তখন সত্যি বলছি বাবু আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম, দাও।

একশ' টাকার পাঁচখানা কর্‌করে নতুন নোট। পকেটে রেখে গাড়ী চালাতে লাগলাম।

একটা ব্যাঙ্কের সুমুখে এসে গাড়ী থামাতে বললে। গাড়ী থেকে নেমে করুণা ব্যাঙ্কে গিয়ে ঢুকলো। ভাবলাম বোধ হয় হিসেব খুলবে।

খানিক পরে দেখি, পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়ালো ব্যাঙ্কের দরজায়। থানার অফিসার একজন কনেষ্টবল সঙ্গে নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে ব্যাঙ্কে ঢুকলেন। পুলিশ দেখেই চোরাই মালের পাঁচখানা নোট—যা আমার পকেটে ছিল, তাড়াতাড়ি বের করে পিছনের সিটের নীচে রেখে দিয়ে ভাল মানুষের মত বিড়ি টানতে লাগলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই! থানার একজন কনেষ্টবল ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়েই আমাকে ডাকলে হাতের ইশারায়। আমি নেমে যেতেই দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, জাল নোটের কারবার কত দিনের?

আমি যেন আকাশ থেকে পড়লাম। কিছু বুঝতে পারলাম না। হাঁ করে' তাকিয়ে আছি, করুণা বললে, ওর পকেট দেখুন।

কনেষ্টবল আমার প্রত্যেকটি পকেট হাত ঢুকিয়ে দেখলে—কিছুই পেলে না। গাড়ীটা সার্চ করা হলো। তন্ন তন্ন করে' খুঁজলে, সিট্ উলটে দেখলে, একখানা নোটও নেই!

আমিও অবাক হয়ে গেলাম। নোট পাঁচখানা গেল কোথায়?

আমাকেও গাড়ী নিয়ে থানায় যেতে হলো।

করুণা যে আমাকে নোট দিয়েছিল সেকথা স্রেফ্ অস্বীকার করে গেলাম। নোটের তাড়া যে এক ভদ্রলোক ফেলে গিয়েছিলেন তাও বললাম না। আমাকে ছেড়ে দেওয়া হলো। গাড়ী নিয়ে আমি ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে চলে গেলাম।

করুণাকে ছাড়লে না। থানায় আটকে রাখলে। বুঝলাম, নোটগুলো সব জাল নোট। ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে গাড়ীর পেছনের সিটটা উল্‌টে দেখলাম। পুরনো গাড়ী, ছেঁড়া গদি। চারিদিকে ফুটো। দেখলাম, একটা লোহার পাতের নীচে নোট পাঁচটি এমনভাবে আটকে রয়েছে, বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।

গাড়ী নিয়ে চলে গেলাম গঙ্গার ধারে। নোট পাঁচটি গঙ্গার জলে বিসর্জন দিয়ে আবার ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাই নিয়ে কত হাঙ্গামা যে হলো তার আর ইয়ত্তা নেই। সেখানকার চাকরি আমি ছেড়ে দিলাম। করুণার পকেট থেকে শুনলাম ছ' হাজার টাকার আর তার বাড়ী থেকে সাত হাজার টাকার জাল নোট পাওয়া গেছে। পাছে ভাগ দিতে হয় ভেবে করুণা আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। অনেক টাকা খরচ করেও করুণা শেষ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি। ছ'মাস জেল হয়ে গিয়েছিল তার।

বিহারীর সুদীর্ঘ কাহিনী শুনলাম।

গহনার কদ করে' দিলাম! গহনার বিজ্ঞাপন লিখে দিলাম।

বন্ধু নগেনের ব্যবহার ভুলতে পারছিলাম না কিছুতেই।

সেদিন বিকেলে কলেজ স্ট্রীটে গিয়েছিলাম। পুরনো বই কেনার অভ্যাস আমার চিরদিনের। সেদিনও পুরণো বই খুঁজছি। হঠাৎ এমন একখানা বই আমার নজরে পড়লো, দেখেই চমকে উঠলাম। আমার নাম লেখা আমারই বই। এ বই আমি আমার বৌবাজারে বন্ধুর কাছে রেখেছিলাম। বইখানার দাম মাত্র এক টাকা। কিনে ফেললাম। সেই বই হাতে নিয়ে গেলাম বৌবাজারে। আজই আমার জিনিসগুলি নিয়ে যাব সেখান থেকে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, এখানেও তাই হলো। দেখলাম বন্ধু আমার নিরুদ্দেশ। বাড়ীখানি তার এক নিকটতম আত্মীয়ের। তরে সঙ্গেও আমার সামান্য পরিচয় ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, দীনবন্ধু গেল কোথায়?

একগাল হেসে তিনি বললেন শেষ পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডিতে ভাল একটি চাকরি পেয়ে গেল। সেইখানেই চলে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন সে আসবে না নিশ্চয়!

তিনি বললেন, অতদূর থেকে আসা কি মুখের কথা মশাই? জিনিসপত্র বিশেষ কিছু নিয়ে যেতেও পারলে না। অমন সব দামী দামী বই—জলের দামে বিক্রি করে দিলে। আমি শুধু ওই টাইপ্‌রাইটারটা রেখেছি—ওই দেখুন।

—পুরণো টাইপ্‌রাইটার, ওর আর কতই বা দাম! চেয়েছিল দু'শ' টাকা। শেষ পর্যন্ত পঁচাত্তোর টাকায় রফা হ'লো।

ফিরে এলাম আমার সেই নোংরা বস্তিতে।

বিহারীর দরজায় তালা বন্ধ। কাজে বেরিয়ে গেছে।

হরমনের মেয়ে চুম্‌কি কলতলায় বসে বাসন মাজছিল।

কেওড়াদের মেয়েটা বক্ বক্ করে বক্‌ছে।

সন্ধ্যা নামতে তখনও দেরি আছে। তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। লণ্ঠনটা তুলে দেখছি তেল আছে কিনা, এমন সময় পা টিপে টিপে চঞ্চলা এসে আমার ঘরে ঢুকলো।

অপরূপ রূপবতী চঞ্চলা। এসেই সে আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসতে লাগলো।

বললাম, এখন তো চান্ করবার সময় নয়। এখন এলে যে!

চঞ্চলা বললে, আপনার বুঝি ভাল লাগে না? বেশ, আর আসবো না। হলো তো?

বললাম, সত্যি বলছি আর এসো না। দিদিমা বকবে।

চঞ্চলা বললে, বকবে বকবে আমাকে বকবে। তাতে আপনার কি?

তাও তো সত্যি! তাতে আমার কি?

চঞ্চলা আবার বললে, দিদিমাই আমাকে পাঠিয়েছে মশাই! তা জানেন?

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

চঞ্চলা বললে, চা খাবেন কিনা জিজ্ঞাসা করতে বললে।

চা!—বললাম, তা, খেলে মন্দ হয় না।

—আপনার কিন্তু জাত যাবে। আমরা বামুন নই।

বললাম, জানি।

চঞ্চলা বললে, হ্যাঁ—আপনার আবার জাত! বিহারীর সঙ্গে ঘরে খিল বন্ধ করে' যে মদ খায়, তার আবার জাত!

—তুমি তাও দেখেছো?

চঞ্চলা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই।

বললাম বিহারীর আর কিছু ছাখোনি? খিল বন্ধ করে শুধু মদ খাওয়াই দেখলে?

চঞ্চলার চোখে মুখে দুষ্টু হাসি লক্ষ্য করলাম।

বাইরে হঠাৎ কিসের যেন গোলমাল শোনা গেল।

কয়েকজন ভদ্রলোক এসেছেন বিহারীর সন্ধানে। আমাকে দেখেই তাঁরা আমার কাছে এগিয়ে এলেন। বাংলা একখানি খবরের কাগজ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এই বিজ্ঞাপন কি এইখান থেকেই দেওয়া হয়েছিল?

বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। বিহারী ড্রাইভার দিয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, গয়নাগুলি আমার স্ত্রীর।

বললাম, তার প্রমাণ?

তিনি বললেন, তক্ষুনি আমরা থানায় ডায়েরী লিখিয়েছি মশাই। এই যে, ইনি এসেছেন থানা থেকে। এলুমেনিয়ামের হাত বাক্স, একখানা তোয়ালে দিয়ে মোড়া। গয়নার ফর্দটা দেখুন।

পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে' তিনি একটি একটি করে' গয়নার নাম, ওজন, সবই বলতে লাগলেন। গয়নার বাক্স গাড়ী থেকে নামানো হয়নি। তিনি নিজে ব্যস্ত ছিলেন ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে। ওদিকে স্ত্রী তখন বাড়ীর ভেতরে চলে গেছেন। স্বামী ভেবেছিলেন--স্ত্রী নিয়ে গেছেন গয়নার বাক্স। বাড়ীতে গিয়ে শুনলেন, স্ত্রী এসেছেন খালি হাতে।

বললাম, বিহারী ড্রাইভার আমি নই। তবে আমি জানি এই গয়নার ব্যাপার। বিজ্ঞাপন আমিই লিখে দিয়েছি!

দারোগাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, বিহারী কোথায় গেছে?

বললাম, ট্যাক্সি নিয়ে কাজে বেরিয়ে গেছে।

—তাহ'লে তো ফিরতে রাত্রি বারোটা!

বললাম, আজ্ঞে না! ওর ডিউটি বিকেল পর্যন্ত। এইবার আসবে বোধ হয়।

—আমরা তা'হলে ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসবো। এখন চলি। নমস্কার!

তাঁরা চলে গেলেন।

চঞ্চলা দাঁড়িয়ে ছিল আমার ঘরের ভেতর।

—এখনও দাঁড়িয়ে আছ? শুনলে সব?

চঞ্চলা তার মাথাটি কাৎ ক'রে বললে, হুঁ।

—এখন বুঝলে তো ঘরে খিল বন্ধ করে' আমরা কি করছিলাম!

চঞ্চলা বললে, বুঝলাম।

বললাম, চা আনলে না ?

চঞ্চলা বললে, আনছি। কিন্তু তার আগে বলুন আপনি এখান থেকে কোথাও যাবেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, যাবার কথা তোমার হঠাৎ মনে হলো কেন ?

চঞ্চলা বললে, এমনই। আমাদের এই নোংরা বস্তিতে এমন কী আছে যার জন্যে আপনি থাকবেন ?

বললাম, যদি বলি—তুমি আছ !

চঞ্চলা মুখ তুলে তাকাতে পারলে না। আসন্ন সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারেও মনে হলো যেন চোখ দুটো তার জলে ভরে এসেছে। তার সেই উদ্‌গত অশ্রু গোপন করবার জন্যই বোধকরি সে ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মহাপুরুষেরা নাকি বলে থাকেন, মানুষের জীবন নাকি দুঃখ জয়ের তপস্যা।

রেলে চাকরি করি, অল্প শিক্ষিত সামান্য মানুষ আমি, ছোট-খাটো দু'-একটা দুঃখকে জয় করেই ভেবেছিল'ম বুঝি আমার জীবনের তপস্যা সার্থক হ'লো।

ভগবান তখন বোধ হয় হেসেছিলেন অলক্ষ্যে থেকে।

আমার মনের সে অহঙ্কার যে তিনি এত শীঘ্র চূর্ণ করে দেবেন—তা আমি ভাবতেও পারিনি।

আঠারো বছরের স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলে। দিলাম কলেজে ভর্তি করে। আই-এ, বি-এ, এম-এ যতদূর পড়তে চায় পড়ুক। নিজেরা একবেলা খেয়ে দিন কাটাবো, ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে পরবো, নিজেদের কষ্টের কথা ছেলেকে বুঝতে দেবো না, সে শুধু পড়বে আর পাশ করবে।

কিন্তু বুদ্ধিমান ছেলে, মাসখানেক পরেই লিখলে, বাবা, এবার থেকে তোমাকে আর হোষ্টেলের টাকা পাঠাতে হবে না। আমার থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে। তাঁর ছোট ছেলেটিকে আমি পড়াব। তার জন্যে তিনি তাঁর মস্ত বড় বাড়ীর নীচের তলার সুন্দর একখানি ঘর আমাকে ছেড়ে দেবেন।

চিঠিখানি পড়তে পড়তে চোখে আমার জল এলো।

স্ত্রীকে চিঠিখানি দেখিয়ে বললাম, নাও পড়।

চিঠিখানি নিয়ে সে সেখান থেকে চলে গেল। কোথায় গেল আমি জানি। ছোট্ট রেলের কোয়ার্টার। তারই একখানি ঘরের এককোণে তার পূজোর জায়গা। দেয়ালের গায়ে ঠাকুরের ছবি। নীচে একটি বসবার আসন।

চিঠিখানি পড়ে সে তার ঠাকুরের পায়ের তলায় নামিয়ে দিলে। তারপর গড় হয়ে প্রণাম করে সে চোখের জলে বুক ভাসাতে লাগলো।

এক মাস তখনও পার হয়নি। কে জানতো তার সেই আনন্দের অশ্রু শোকাশ্রুতে পরিণত হবে!

কে জানতো সেই ছেলে আমার মরে যাবে।

অকস্মাৎ টেলিগ্রাম এলো কলকাতা থেকে। হোষ্টেল থেকে যে-বাড়ীতে সে গিয়েছিল সেই বাড়ীর মালিক আমার অপরিচিত এক ভদ্রলোক টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন—আপনার ছেলের কলেরা হয়েছিল, কিছুতেই তাকে বাঁচানো গেল না, গত রাত্রে সে আমারই বাড়ীতে মারা গেছে। কলেরার রুগী, মৃতদেহ বাড়ীতে রাখা সম্ভব হচ্ছে না।

বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

সারা পৃথিবীটা চোখের সুমুখে ঝাপসা হয়ে গেল। স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়লো তার ঠাকুরের কাছে।

আমার রেলের চাকরি। ছোট ষ্টেশন। এক মুহূর্ত দেরি করবার উপায় নেই। এতটুকু ভুলচুক হবার উপায় নেই।

আমার চোখের সুমুখে ট্রেন যাচ্ছে কলকাতায়। যাত্রীদের টিকিট দিচ্ছি কলকাতার। কিন্তু আমার হাত-পা বাঁধা। ছেলে মরেছে কলকাতায়। মৃতদেহ নিয়ে গেছে শ্মশানে। পুড়িয়ে এতক্ষণ ছাই করে দিয়েছে!

দিক্। সব-কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যাক্। আমার প্রয়োজন বলে আর কিছু নেই।

মানুষ চিরকাল বাঁচে, না জানি। আমরাও একদিন মরে যাব—তাও সত্য, কিন্তু আমার ছেলের মত এমন কাঁচা বয়সে—এমন করে মা-বাপের কোল থেকে হে ভগবান, কাউকে তুমি কেড়ে নিও না!

না না, ভগবান নেই। এখানে কোনও নিয়ম নেই, শৃঙ্খলা নেই, এ পৃথিবী একটা খামখেয়ালী অরাজক পুরী, মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

মহাপুরুষের বাণী আমাকে কোনো সান্ত্বনা দিতে পারলে না। দুঃখ জয়ের সাধনা—কথাটা মনে হলো যেন মর্মান্তিক উপহাস!

এ-দুঃখ জয় করার ক্ষমতা আমার নেই।

জীবনে তপস্যা আমার সার্থক হবার নয়, আর সেইজন্যই বোধ হয় আমার এই নিদারুণ ভাগ্যবিড়ম্বনা। এ যে কতখানি মর্মান্তিক—ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না।

একে আমি ভুলি কেমন করে ?

আমাদের আহার গেল, নিদ্রা গেল, কাজ গেল, কর্ম্ম গেল, শয়নে স্বপনে জাগরণে আমার সবকিছুকে আড়াল করে দাঁড়াচ্ছে আমার সেই হারানো ছেলে—যাকে আর কোনদিন ফিরে পাবার আশা নেই।

খবর পেয়ে আমার দুঃখে সান্ত্বনা দেবার জন্যে এলো আমার এক বন্ধু। জিজ্ঞাসা করলাম, বলতে পারো, এত বড় দুঃখ ভগবান কেন আমায় দিলেন ?

বন্ধু বললে, মানুষ বড সুখ চায়, তাই বড দুঃখ ভগবান মানুষের জন্যেই তুলে রাখেন।

কথাটা উপহাসের মত শোনালো। বললাম, বড সুখ······

বন্ধু বললে, হ্যাঁ। ছোট-খাটো সুখে মানুষের মন ভরে না।

বললাম, থাক্ আর সুখের কথা বলো না। কিন্তু এ দুঃখ যে আমি সহ্য করতে পারছি না ভাই! শুনেছি ভগবান পরম করুণাময়। এই কি তাঁর করুণা ?

বন্ধু বললে, ভগবানকে দোষ দিও না। মানুষকে তিনি যেমন দুঃখ দিয়েছেন, দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতাও দিয়েছেন।

—কোথায় ক্ষমতা ভাই, সহ্য করতে আমি পারছি না।

বন্ধু বললে, পারবে। সবাই পারে, তুমিও পারবে! আমি দেখেছি নিরানব্বই দিনের পর থেকে মানুষেব যত বড দুঃখই হোক্, মানুষ ভুলতে আরম্ভ করে। তোমাদেরও ঠিক তাই হবে। এই পৃথিবীর নিয়ম।

বন্ধু মিথ্যা বলেনি।

জীবন ধারণের প্রয়োজনে সবই আমাদের করতে হলো।

দু'মাস যেতে না যেতেই এলো অন্য স্টেশনে বদ্‌লির হুকুম। স্ত্রী আর আমার ছোট মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম সেখানে।

ব্র্যাঞ্চ লাইনের ছোট একটি স্টেশন। যেদিকে তাকাই দেখি, শাল মহুয়া আর পলাশের জঙ্গল। জায়গাটি চমৎকার। সারা দিনে ও রাত্রে মাত্র চারখানি ট্রেন আর খান-দুই মাল-গাড়ী।

স্টেশন যাত্রী খুবই কম। জন দশ-বারো ওঠে, জন চার-পাঁচ নামে। কাজের চাপ খুব কম।

আমাকে সাহায্য করবার জন্য একজন বাঙ্গালী বাবু এখানে পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন একটি কন্যা রেখে। কন্যাটি আমাদের টুনুর সমবয়সী।

ভালই হ'লো। টুনু তার খেলায় একজন সাথী পেলে।

পাঁচ বছরে দুটি মেয়ে টুনু আর রুনু।

দক্ষিণ দিকের জঙ্গলটা পার হলেই যে গ্রামটি পাওয়া যায়—সেই গ্রামে গ্রামে প্রতি রবিবার হাট বসে।

ছোটবাবুকে স্টেশনে বসিয়ে রেখে কিছু তরিতরকারি কেনবার জন্যে নিজেই সেদিন হাটে গিয়েছিলাম। টুনু ধরে বসলো সে যাবে আমার সঙ্গে। কিছুতেই ছাড়লে না। এমন ঝোঁক ধরে বসলো—নিয়ে যেতে বাধ্য হলাম।

জঙ্গল পার হ'য়ে এতটা পথ হেঁটে টুনুকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না।

বললাম, এতটা পথ হেঁটে যেতে তোমার কষ্ট হবে। তুমি থাকো।

টুনু বললে, না, সে যাবেই.

অনেক পরে বুঝলাম রুনুর একটি মাটির পুতুল আছে, তারও সেই রকম একটি পুতুল চাই।

বললাম, আমি এনে দেবো।

টুনু বললে, না, তুমি পারবে না বাবা, আমি নিজে আনবো।

স্টেশনের একজন খালাসীকে সঙ্গে নিলাম। টুনু গেল তার কোলে চড়ে।

পাঁচ পয়সা দামের মাটির একটি পুতুল।

সেই পুতুল নিয়ে টুনুর কি আনন্দ!

মার কাছে গিয়ে বললে, এই ছাখো মা, আমার মেয়ে ছাখো।

কই দেখি! মা তার পুতুলটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একবার দেখলে। দেখবার কিছু নেই। পল্লীগ্রামের কোন্ এক শিল্পীর তৈরি কাঁচা মাটির পুতুল। শুকিয়ে রং করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাকেই সে আদর করে চুমু খেয়ে হেসে বললে, বাঃ বেশ খুকুমণি হয়েছে। এটি বুঝি তোমার মেয়ে?

ঘাড় নেড়ে মাথার একমাথা থোকা থোকা চুল দুলিয়ে খুব খানিকটা হেসে টুনু বললে, হ্যাঁ মা, আমার খুকুমণি।

আমি কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। টুনুর মা বললে, হ্যাঁগা, আমাদের তাহ'লে কে হচ্ছে?

বললাম, টুনুর মেয়ে। আমাদের নাতনী।

. টুনুর মা বললে, এবার রাখো তোমার মেয়েকে ওইখানে নামিয়ে। সেই কোন্ সকালে চারটি খেয়েছো, এসো খাবে, এসো।

টুনু বললে, বারে, আমার খুকুমণিকে খাওয়াতে হবে না! আগে খুকুমণিকে খাওয়াই, তারপর খাব।

ঝিনুক দিয়ে টুনুর মা যেমন করে দুধ খাওয়ায়, টুনু তার মেয়েকে ঠিক তেমনি ক'রে কোলে বসিয়ে কাল্পনিক ঝিনুক দিয়ে কাল্পনিক দুধ খাইয়ে নিজের ফ্রক দিয়ে তার মুখ মুছিয়ে বললে, চল এবার আমি খাইগে।

দেখলাম, আমাদের তিন বছরের টুনু সেদিন থেকে রীতিমত মা হয়ে বসলো।

যখনই দেখতে পাই, দেখি, টুনু তার মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত। কখনও দেখি পুতুলটিকে সে কোলে নিয়ে নেচে নেচে ঘুম পাড়াচ্ছে, কখনও দেখি তাকে কোলে শুইয়ে দুধ খাওয়াচ্ছে, কখনও দেখি আদর করছে, আবার কখনও দেখি—তিরস্কার চলছে।

সেদিন দেখলাম খুকুমণিকে টুনু খুব মারছে, জিজ্ঞাসা করলাম, ওকে এত মারছো কেন মা টুনু, কি দোষ করেছে?

টুনু বললে, তুমি চুপ কর বাবা, তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেলে! বলেই খুকুমণির মাথায় এক চড়!

—খালি খালি কাঁদছে, খালি খালি কাঁদছে! দুধ খাবে না, কিচ্ছু না, রাস্তায় খেলা করতে গিয়ে ছাখো না কি রকম ধুলো মেখেছে। আমি আর পারি না বাবা, মরণ হয়ত বাঁচি!

ঠিক তার মা যে-সব কথা বলে হুবহু সেই কথাগুলিই সে বলে চলেছে।

এমনি করেই বিশ্বজননীর লীলা চলছে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। মা থেকে কন্যায় আবার কন্যা থেকে মায়ে।

হাসতে গিয়েও হাসতে পারলাম না। টুনুর মুখে 'মরণ হয় ত বাঁচি!' কথাটা কেমন যেন ধক্ করে' বাজলো আমার বুকে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ হাসির শব্দে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, টুনুর মা হাসছে।

তার হাসি দেখে আশ্বস্ত হলাম। বললাম, শুনেছো? তোমার মেয়ে যে খেটে খেটে হয়রাণ হয়ে গেল।

টুনুর মা বললে, হবে না? অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে, কাল রাত্তিরে বিছানায় মুতেছে।

ভাবলাম, কথাটা বলা তার উচিত হলো না। টুনু হয় ত' লজ্জা পাবে। কিন্তু দেখলাম, লজ্জা সে পেলে না। যে মা হয়েছে তার আবার লজ্জা কিসের?

টুনু বললে, যাই, এই সময় রোদ্দুর আছে। কাঁথাটা জল দিয়ে কেচে শুকোতে দিইগে।

স্টেশনের কাজ নিয়ে ছিলাম, টুনুর মেয়ের কথা মনেই ছিল না, হঠাৎ সেদিন টুনু বললে, বাবা, তোমার আর মায়ের নেমন্তন্ন।

—কিসের নেমন্তন্ন গো?

গম্ভীর মুখে টুনু বললে, কাল আমার মেয়ের বিয়ে।

বললাম, সে কি গো, কোথায় বিয়ে?

টুনু বললে, রুনুর ছেলের সঙ্গে।

কিন্তু এরই মধ্যে তার মেয়ের বিয়ের বয়স হ'লো কেমন করে বুঝলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, মেয়ে তোমার ক' বছরের হ'লো টুনু? .

হিসেব তার ঠিকই আছে। বললে, ষোলো বছরের মেয়ে, কাল সতেরোয় পড়বে।

বয়সের রহস্য এতক্ষণে বুঝলাম। একদিনে যে তাদের এক বছর হয় সেকথা জানতাম না।

সারাটা দিন দেখলাম, টুনুর বিশ্রাম নেই। কাল যার মেয়ের বিয়ে, বিশ্রাম সে করবে কেমন করে?

টুনু ঘন-ঘন রুনুদের কোয়ার্টারে যাওয়া-আসা করতে লাগলো।

টুনুর মেয়ে আর রুনুর ছেলে।

বিকেলে দেখলাম, বৌ এর গায়ে হলুদের তত্ত্ব নিয়ে রুণু নিজেই এলো। হলুদে-ছোপানো দুটি ছোট ছোট ন্যাকড়া, কয়েকটি পলাশের ফুল, দুটি বাতাসা আর এক মুঠো চিনি।

পরের দিন বিয়ে।

বর নিয়ে রুণু এলো। সিগারেটের প্যাকেটের ভেতর যে রাংতা থাকে, সেই রাংতা-কাগজ দিয়ে টোপর তৈরি ক'রে বরের মাথায় এঁটে দেওয়া হয়েছে। হলুদ রঙের কাপড় পরিয়েছে।

এদিকে টুনুর মেয়েও সেজেছে চমৎকার। তার মা সাজিয়ে দিয়েছে নাতনীকে।

সন্ধ্যায় তারা ঘুমিয়ে পড়বে, কাজেই বিয়েটা চুকে গেল বিকেল বেলায়। টুনুর মা রান্না করেছিল সকাল-সকাল। দুই বেয়ানকে পাশাপাশি বসিয়ে খাইয়ে দিলে।

পরের দিন মেয়ে যাবে শ্বশুরবাড়ী।

টুনুর দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

আকাশে মেঘ ছিল। পরের দিন সকালে দেখা গেল, সারা আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে।

দেখতে দেখতে ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামলো।

মেয়ের শ্বশুরবাড়ী বেশি দূরে নয়। নেহাৎ কাছেও নয়। যেতে হলে ভিজতে হবে।

বললাম, আজ আর তোমার মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাজ নেই টুনু।

টুনুও বোধ করি সেই ভাবনাই ভাবছিল। অবিরাম বৃষ্টিধারার দিকে শুক্‌নোমুখে চুপ ক'রে বসে রইলো।

বৃষ্টি আর ধরে না কিছুতেই।

দুপুরের খাওয়া চুকে গেল। তখনও বৃষ্টির বিরাম নেই।

বিকেলের দিকে বৃষ্টি একটুখানি ধরলো, কিন্তু আকাশ তখনও কালো মেঘে ঢাকা।

ছুটতে ছুটতে একটা গামছা মাথায় দিয়ে রুণু এলো আমাদের বাড়ী। ছেলের মা এলো আমাদের বাড়ী। ছেলের মা এলো মেয়ের মার কাছে।

রুণু বললে, মেয়ে জামাই এখনও গেল না কেন?

টুনু বললে, পাঠাবো কেমন করে? বৃষ্টি হচ্ছে যে!

রুণু বললে, হোক না বৃষ্টি, নৌকো ক'রে পাঠালেই পারতে!

নৌকোর কথা টুনুর মনে ছিল না।

আমাদের কোয়ার্টারের পেছন দিকে মস্ত বড় একটা নালা কেটে পাহাড়-জঙ্গলের গড়ানে জল সাঁওতাল চাষীরা বোধ হয় চাষের মাঠে নিয়ে যায়। সে নালা এখন বর্ষার জলে কানায় কানায় ভরা।

সেই নালার নদীতে নৌকো ভাসালে নৌকো গিয়ে লাগবে রুণুদের বাড়ীর পেছনে।

টুনু আমাকে ধরে বসলো স্টেশনের মোটা কাগজ দিয়ে একটি নৌকো তৈরি ক'রে দিতে হবে।

তাই দিলাম।

টুনু বললে, তুই ভাই তোদের ঘাটে গিয়ে দাঁড়া। আমি নৌকো ছাড়ছি।

রুণু ছুটলো তাদের বাড়ীর দিকে।

কাগজের নৌকোর ওপর মেয়ে-জামাইকে বসিয়ে নৌকো ভাসিয়ে দেওয়া হ'লো নালার জলে।

টুনু চীৎকার ক'রে বললে, ভাসিয়েছি।

ওদিক থেকে রুণু জবাব দিলে, আমি দাঁড়িয়ে আছি।

হেলে দুলে নৌকো চললো তর্ তর্ ক'রে। জলভরা চোখে টুনু একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে।

নৌকো তখনও বেশিদূর যায়নি, এমন সময় ঝম্ ঝম্ ক'রে বৃষ্টি নামলো। টুনু সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। টুনুর মা দেখতে পেলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে তাকে এক রকম জোর করেই টানতে টানতে বাড়ীতে নিয়ে এলো।

সেখান থেকে আসতে সে চায়নি। মেয়ে-জামাই রুণুদের বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছালো কি না কে জানে।

টুনুর মা বললে, রুণু সেখানে দাঁড়িয়ে আছে, নৌকো সে ধরে নেবে ঠিক।

টুনু ছট্‌ফট্ করতে লাগলো, খবরটা জানবার জন্যে। বলতে লাগলো হে ভগবান, হে মা কালী, মা দুর্গা, বৃষ্টি থামিয়ে দাও। আমার মেয়ে-জামাই আছে নৌকোয়! না মা, আমি যাই।

মা বললে, যাবি, দাঁড়া, বৃষ্টি থামুক।

বৃষ্টি থামলো অনেকক্ষণ পরে।

টুনু ছুটলো রুণুদের বাড়ীর দিকে।

ওদিকে রুণুও তখন ছুটতে ছুটতে এইদিকেই আসছে।

মাঝ পথে দু'জনের দেখা!

টুনু জিজ্ঞাসা করলে, নৌকো ধরেছিস্ তো?

রুণু ঘাড় নেড়ে বললে, কই না তো! কোথায় নৌকো?

সে কি, নৌকো তাহ'লে কোথায়?

চল্ দেখি! বলে দু'জনেই ছুট্‌লো নালার দিকে। নালার ধারে ধারে তারা দুই বন্ধু কতবার যে আনাগোনা করলে তার অন্ত নেই। কিন্তু নৌকোর কোনও চিহ্নই তারা দেখতে পেলে না।

ভারি মাটির পুতুল, তার ওপর বৃষ্টির ছাঁট। নৌকো ঠিক মাঝ দরিয়ার ভরাডুবি হয়ে গেছে।

মেয়ে দুটো কাঁদছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

খবর পেয়ে খালাসীকে পাঠিয়ে দিলাম!—'ছাখো তো বাবা জলে নেমে হাতড়ে হাতড়ে যদি পাও......'

খালাসী এসে খবর দিলে পাওয়া গেছে। জলের তলায় কাগজের নৌকো ভিজে চুপসে এইটুকু হয়ে গিয়েছিল। আর দুটো পুতুলের একটাকে পাওয়া গেছে। বর বলে আর চেনা যায় না, রং-টং ধুয়ে মুছে মাটির একটা ঢেলার মত—তুলতেই রুণু বললে, এ হচ্ছে বর—এ আমার ছেলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কনেকে পেলে না?

খালাসী বললে, না বাবু, অনেক খোঁজাখুঁজি করলাম। পেলাম না। মাটির কনে—পুতুল জলের ভেতর গলে গিয়ে বোধ হয় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।

টুনু সেই দুঃখে ওইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আসছে না কিছুতেই।

আমি নিজে গেলাম। গিয়ে দেখি, সত্যই তাই। রুণু বাড়ী চলে গেছে। কিন্তু টুনু সেই নালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কাঁদছে।

অনেক ক'রে তাকে বুঝিয়ে বললাম। অতি কষ্টে তাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আনলাম।

কিন্তু কান্না তার কিছুতেই থামাতে পারি না।

বললাম, আসছে হাটবারে আমি নিজে হাটে গিয়ে তোমার জন্যে আবার ঠিক তেমনি একটি পুতুল এনে দেবো।

কিন্তু কিছুতেই না। থাকে থাকে আবার কেঁদে কেঁদে ওঠে। বলে, না, আমার সেই মেয়েটিই চাই।

আমি বুঝালাম, তার মা বুঝিয়ে বললে, ওর চেয়ে অনেক ভাল মেয়ে এনে দেবো তোমার, কেঁদো না, চুপ কর।

কিন্তু কান্না তার কিছুতেই থামে না।

বনানীপ্রান্ত অন্ধকার ক'রে আবার ঝম্ ঝম্ শব্দে বৃষ্টি নেমেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মেঘ ডাকছে। অনেক কষ্টে টুনুকে আমার কোলের ওপর শুইয়ে ঘুম পাড়িয়েছি।

ঘুমের ঘোরে এখনও সে ফুলে উঠছে।

আঠারো দিনের স্নেহে যত্নে মানুষ-করা তার মেয়ে গেছে হারিয়ে।

আর আমার ?

বুকের রক্ত দিয়ে মানুষ-করা আঠারো বছরের ছেলে! মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে গেছে। ইহজীবনে আর ফিরে পাবার আশা নেই।

টুনুর অশ্রুম্লান মুখখানির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবার নতুন করে সেই কথাই ভাবছি। বুঝতে পারিনি অজান্তে কখন আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এসেছে।

বাইরে ভীষণ দুর্যোগ।

এ দুর্যোগ বুঝি থামবে না!

টুনুর মা ঘরে ঢুকলো। বললে, টুনু বুঝি কোলেই ঘুমিয়েছে? ওকে ওইখানে শুইয়ে দিয়ে খেয়ে নেবে এসো।

বললাম ঠিক বলেছো। খেতে হবে। চল, যাই।

টুনুকে বিছানায় শুইয়ে রেখে রান্নাঘরে গেলাম।

বাইরে দুর্যোগ তখনও চলছে।

স্ত্রী বললে, আবার স্টেশনে যেতে হবে তো?

বললাম, যেতে হবে বই-কি! রাত্রের গাড়ী দুটো পার করবে কে?

বাপ নাম রেখেছিল বিক্রম। তার কি দোষ?

যে-গ্রামে সে বাস করতো, সে-গ্রামের নাম ছিল প্রতাপগড়।

জন্মাবধি যে বাড়ীটা সে দেখছে, বাপ মারা যাবার পর উত্তরাধিকার সূত্রে যে বাড়ী সে পেয়েছে, বাড়ীখানা ভাঙ্গা, পুরণো, জরাজীর্ণ। হ'লে কি হবে, বাড়ীটার সুমুখে ছিল কয়েকটা বড় বড় থাম। থামগুলো অবশ্য ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে, তবু মনে হয়, এ বাড়ী যাঁরা তৈরি করেছিলেন তাঁরা এককালে বড়লোক ছিলেন।

তার ওপর সেই বাড়ীর উঠোনে একটা কুয়ো খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া গেল রূপোর একটা ভাঙ্গা তলোয়ার।

এর পরেও সন্দেহ কববার যদি-বা কিছু ছিল তাও একদিন নিরসন হয়ে গেল।

বিক্রমের বাপ মারা গেল; বিক্রমের বয়স তখন কুড়ি কি একুশ। বাপের ছিল একটি ভাঙ্গা কাঠের হাত-বাক্স। সেই বাক্সের ভেতর পাওয়া গেল তিনটি সোনার মোহর।

বাস্, বিক্রমের স্থির বিশ্বাস হয়ে গেল—তাদের বংশ—রাজা-মহারাজার বংশ। বিক্রমের ধারণা, বাপ তার জানতো সব। বলতো না। বলতো না—গরীব হয়ে গিয়েছিল বলে'। আর ভাবত হয়ত' ছেলে তার মনে কষ্ট পাবে।

বিক্রম তার বাল্যকালেই এই সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছিল। বলেছিল তার বাপকে বহুবার। কিন্তু যতবার বলতে গেছে, ততবার ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে।

এখন আর তাকে ধমক দেবার কেউ নেই।

এখন সে স্বাধীন।

স্ত্রী ছিল, সেও মারা গেছে। থাকবার মধ্যে আছে তার এক কন্যা।

ছেলে একটা ছিল। আজ সে বেঁচে থাকলে অনেক বড়টি হতো। বিক্রমের বাপ তাকে ডাকতো মাণিক বলে।

বিক্রম তার নাম রেখেছিল মাণিক্য বাহাদুর। মহারাজকুমার মাণিক্য বাহাদুর।

সেই ছেলের মৃত্যুর পর থেকেই বিক্রমের মাথাটা যেন একটু বেশি পরিষ্কার হয়ে গেল।

বলতে লাগলো, ছেলেটার লক্ষণ ছিল ভাল। বেঁচে থাকলে সে তার রাজত্ব ফিরিয়ে আনতে পারতো।

আইনের জোরে না পেতো, যুদ্ধ ঘোষণা করতো।

তখন থেকে বিক্রমকে কেউ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতো—তার নাম মহারাজাধিরাজ বিক্রমজিৎ বাহাদুর।

মেয়ের নাম রেখেছে—মহারাজকুমারী মণিমালা।

মহারাজার সম্পত্তির মধ্যে আছে মাত্র বিঘে-পঁচিশেক ধানের জমি, ভাল একটা পুকুর, আর একটি আমের বাগান।

বাপ আর মেয়ের খরচ তাইতেই কোনোরকমে চলছিল, কিন্তু আর যেন চলে না!

সে বছর শীতকালে অনেকগুলো ধান বিক্রি করে' বিক্রমজিৎ বাহাদুর শহর থেকে তার পোষাক কিনে আনলে। চোস্ত্ পাজামা, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা কোট, মাথার পাগড়ি, আর রূপো বাঁধানো একটি লাঠি!

পাগড়ী-পরা বাপকে দেখে মণিমালা হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারলে না।

বললে, আচ্ছা বাবা, এ-সব কি তোমাব না আনলেই চলছিল না!

বিক্রম বললে, কেন আনলাম তা তুই কেমন করে' জানবি মা? তোর বিয়ের জন্যে আমাকে যেতে তো হবে বড় বড় মহারাজার বাড়ী! সাজ পোষাক না থাকলে সম্মান থাকবে কেমন করে!

তার ওপর আজকাল আর-একটা বাতিক উঠেছে বিক্রমজিৎ-মহারাজের।

প্রতাপগড় গ্রামের কাছাকাছি একটা গ্রামে ধর্ম্মরাজ-ঠাকুরের মন্দির আছে। সেই মন্দিরের একজন পুজোরীর বাড়ীতে এক রকম মাদুলী পাওয়া যায়। ধারণ করলে বাত ভাল হয়।

প্রতাপগড় গ্রামের মাঝখান দিয়ে সেই গ্রামে যাবার পথ। তাই প্রায়ই দেখা যায় বহুদূরের গ্রাম থেকে লোকজন যাওয়া আসা করছে প্রতাপগড়ের

মাঝখান দিয়ে। আবার কখনও-বা দেখা যায়, ক্লান্ত পথযাত্রীর দল বিশ্রাম করছে প্রতাপগড়ের বারোয়ারীতলায়।

মধ্যাহ্নভোজনের আগে মহারাজা বিক্রমজিতের সঙ্গে যদি তাদের দেখা হয়ে যায়, তাহ'লে আর রক্ষা নেই!

মহারাজা-বাহাদুর গিয়ে হাতজোড় করে দাড়াবে তাদের কাছে, বলবে, আসুন আপনারা, আমার বাড়ীতে পায়ের ধূলো দেবেন। না খাইয়ে আপনাদের আমি ছাড়বো না।

বলবে হয়ত'—কত অতিথি সৎকার করে গেছেন আমার পূর্ব্বপুরুষেরা। আমি নরাধম, তাই পারি না কিছু করতে। কিন্তু নরাধম হ'লেও তাঁদেরই বংশধর তো!

ভুল করে' যদি কেউ হঠাৎ তার বংশপরিচয় জানতে চায়, রাজাবাহাদুর কৃতার্থ হয়ে গিয়ে বলবে, প্রতাপগড়ের রাজবংশের নাম শোনেননি? আমার নাম মহারাজাধিরাজ বিক্রমজিৎ-বাহাদুর।

নাম শুনে আৎকে উঠে কেউ যদি দয়া করে' রাজবাড়ীতে পায়ের ধূলো দিতে যায় তবেই, নইলে ওই অত বেলায় মহারাজকুমারীকে উনোন ধরিয়ে আবার রান্না করতে হয়।

মহারাজকুমারী মণিমালার ডাক ছেড়ে এক একদিন কাঁদতে ইচ্ছে করে।

পাড়া-প্রতিবেশিনী মেয়েরা কেউ কেউ হয়ত' জিজ্ঞাসা করে বসে, বলি হ্যালা মণি, বাপটা কি তোর মুখের পানে একবার ফিরেও তাকায় না?

কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারে না মণিমালা। বোকার মত তাকিয়ে থাকে হা করে'।

মেয়েদের ভেতর কেউ হয়ত' বলে, কথাবার্তায় তো কোনও গোলমাল নেই। পাগল বলে তো মনে হয় না।

মণিমালা এর কী জবাব দেবে? মুখ বুজে দাড়িয়ে থাকে চুপ করে'। চলেও যেতে পারে না, কিছু বলতেও পারে না।

এবার কোনও মেয়ে হয়ত আসল কথাটা পেড়ে বসে। বলে, তোর বয়েস তো হ'লো অনেক, বাপের বোধ হয় বিয়ে দেবার ইচ্ছে নেই।

মণিমালার মুখখানি শুকিয়ে যায়!

বিক্রমজিৎ সেদিন কোথায় যেন গিয়েছিল, বাড়ী ফিরছে ক্লান্ত হয়ে, রাস্তায় একটি লোকের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলে, মহারাজা বিক্রমজিতের বাড়িটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন ?

বিক্রমজিৎ বললে, কেন বলুন তো ?

লোকটি বললে, অনেক দূর থেকে আসছি তাঁর নাম শুনে।

বিক্রমজিৎ বললে, বুঝতে পারছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।

বিক্রমজিৎ অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে।

—অনেক দূর থেকে আপনি তাহ'লে শুনেছেন তাঁর নাম ?

ব্রাহ্মণ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। তাঁর নাম শুনেই এলাম।

বিক্রমজিৎ তার বাড়ীতে তাকে নিয়ে গিয়ে বললে, বসুন।

ব্রাহ্মণ বললে, বসবো কি মশাই, মহারাজের বাড়ীটা আমাকে দেখিয়ে দিন !

বিক্রমজিৎ বললে, এইটিই মহারাজার বাড়ী। আমিই মহারাজ বিক্রমজিৎ-বাহাদুর।

বিক্রমজিতের মুখের দিকে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর প্রণাম করবার জন্যে যেই সে হাত বাড়িয়েছে, বিক্রমজিৎ বললে, থাক্ থাক্, আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়। এবার বলুন আপনি কি জন্যে এসেছেন ?

ব্রাহ্মণ বললে, আমার একটি কন্যা আছে।—মানে বিবাহযোগ্যা বললেও ভুল বলা হয়, অরক্ষণীয়া। বুঝলেন ? তারই বিবাহের জন্যে ঘুরে ঘুরে হায়রাণ হয়ে গিয়ে শেষে এক জায়গায় ঠিক করেছি। কিন্তু যে টাকা আমাকে দিতে হবে সে টাকা আমার নেই। তাই ভিক্ষায় বেরিয়েছিলাম। কুলন্থর গ্রামের এক ভদ্রলোক বললেন, যেখানে সেখানে ঘুরে কেন বেড়াচ্ছেন মশাই, আপনি চলে যান প্রতাপগড় গ্রামে, সেখানে গিয়ে মহারাজ বিক্রমজিতের সঙ্গে দেখা করুন, তিনি আপনার ব্যবস্থা করে দেবেন। বাস্, তারপর তো আপনি সবই জানেন।

বিক্রমজিৎ একটু চিন্তিত হলো। কিন্তু মহারাজা বিক্রমজিতের চিন্তিত হ'লে চলে না। তৎক্ষণাৎ সে চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিলে। বললে, বেশ তো। স্নান করুন, খান, তারপর দেখা যাবে আমি কি করতে পারি।

অতিথির খাওয়ার ব্যবস্থা ভাল হওয়া উচিত। তার ওপর নাম শুনে যখন এসেছে এতখানি পথ।

বিক্রমজিৎ ব্রাহ্মণকে স্নান করতে পাঠিয়ে নিজে জেলেদের বাড়ী গিয়ে মাছ চেয়ে আনলে।

—দে বাবা, সামান্য যা আছে তাই দে। আমার বাড়ীতে ব্রাহ্মণ এক অতিথি এসেছে আমার নাম শুনে!

বিক্রমজিতকে দিতে কেউ কুণ্ঠিত হয় না। জানে, যা সে করেছে তা নিজের জন্য নয়।

ব্রাহ্মণকে ভাল করে খাইয়ে বিক্রমজিৎ ভাবলে, কি তাকে দেওয়া উচিত? কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ, যদি সামর্থ্য থাকতো তাহ'লে তার যাবতীয় ব্যয়ভার সে-ই বহন করতো।

বিক্রমজিৎ তার বাবার সেই কাঠের বাক্সটি খুলে সোনার একটি মোহর বের করে এনে ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে প্রণাম করলে।

সোনার মোহর!

ব্রাহ্মণ ভেবেছিল, লোকটি পাগল। বাড়ীঘরদোর দেখে তার মনে হয়েছিল, এতখানি পথ সে বৃথাই এলো।

কিন্তু সোনার একটি মোহর দিয়ে বিক্রমজিতকে প্রণাম করতে দেখে ব্রাহ্মণ একেবারে অভিভূত হয়ে গেল। বিক্রমজিতের মুখের পানে তাকিয়ে দেখলে, তার চোখে জল।

বিক্রমজিৎ বললে, আমার আর সামর্থ্য নেই। আপনি আমার এই অক্ষমতার জন্য আমাকে ক্ষমা করুন!

ব্রাহ্মণের মনে হলো—সত্যযুগ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে এই মানুষটি যেন এই কলিযুগে এসে অবতীর্ণ হয়েছে!

মোহরটি নিয়ে বিক্রমজিতের জয়গান করতে করতে ব্রাহ্মণ বিদায় নিলে।

ব্রাহ্মণের অবিবাহিতা কন্যার কথা শুনে তার নিজের কন্যার কথা মনে পড়লো।

কিন্তু মহারাজকুমারী মণিমালার বিবাহ তো সাধারণ কোনও গৃহস্থের সংসারে হতে পারে না।

রাজকুমারীর জন্য চাই রাজকুমার।

বিক্রমজিৎ তার যে পোষাকটি তৈরি করিয়েছিল, সেইটি একদিন সে পরে ফেললে। চোস্ত্ পায়জামা পরলে, আচকান পরলে, মাথায় পাগড়ী বাঁধলো, তারপর তার সেই রূপো-বাঁধানো লাঠিটি হাতে নিয়ে, নাগ্রা জুতো পায়ে পায়ে দিয়ে 'শ্রীদুর্গা' 'শ্রীদুর্গা' বলতে বলতে বেরুলো বাড়ী থেকে।

মহারাজের এই বিচিত্র পোষাক দেখে গ্রামের ছেলেমেয়েরা তার পিছু পিছু ছুটলো। যে দেখলে, সে-ই জিজ্ঞাসা করলে, কোথায় যাওয়া হবে মহারাজের?

বিক্রমজিৎ বললে, মণিমালার জন্যে একটি পাত্রের সন্ধানে বেরুচ্ছি।

সে তল্লাটে রাজা-মহারাজা ক' জনই-বা আছে।

বিক্রমজিৎ কোথাও যেতে বাকি রাখলে না। কিন্তু সবাই যে তাকে উন্মাদ ভেবে বিদায় করলে, সেকথা সে টেরও পেলে না।

বিক্রমজিৎ হঠাৎ একদিন সংবাদ পেলে, বিজয়নগরের রাজা এখনও অবিবাহিত। তিনি একটি পাত্রীর সন্ধান করছেন।

বিজয়নগরের রঞ্জন-সাহেব!

রঞ্জন-সাহেবের চৌদ্দ পুরুষে কেউ কখনও রাজা ছিলেন না। তবে তাঁর জমিদারী ছিল মস্ত বড়। মদ্যপান এবং আনুষঙ্গিক আরও সব ব্যাপারে জমিদারী তখন তিনি প্রায় ফুঁকে এনেছেন।

সেদিন রঞ্জন-সাহেবের জলসা-ঘর তখন জমজমাট।

এমন সময় রঞ্জন-সাহেবের খাস খানসামা এসে তাঁকে সংবাদ দিলে—প্রতাপগড়ের মহারাজা-বাহাদুর তাঁর দর্শনপ্রার্থী।

প্রতাপগড়ের মহারাজা-বাহাদুর!

নাম কখনও শুনেছেন বলে মনে হলো না তাঁর। তবু মহারাজা যখন দর্শনপ্রার্থী, দর্শন তাঁকে দিতেই হয়।

জলসা ঘরের পাশেই তাঁর খাস-কামরা।

রঞ্জন-সাহেব বললেন, 'মহারাজাকে এনে বসাও আমার খাস কামরায়।'

বলেই তিনি তাঁর হাতের পানপাত্রটি বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, ঢালো।

প্রচুর মদ্যপান করে রঞ্জন-সাহেব খাস কামরায় এলেন।

মহারাজা বিক্রমজিতকে দেখেই তো রঞ্জন সাহেবের চক্ষু স্থির!

হাব-ভাব সাজ-পোষাক দেখেই রঞ্জন সাহেব বুঝতে পারলেন। কথা বলবার প্রয়োজন হলো না।

রঞ্জন-সাহেব রঙে ছিলেন। মহারাজা বিক্রমজিতের সুমুখে এসে কৌতূহল দমন করতে পারলেন না। লম্বা একটি কুর্নিশ করলেন।

কুর্নিশ ক'রে বললেন : মহারাজা বাহাদুরের কি হুকুম?

বিক্রমজিৎ সবিনয়ে পেশ করলে তার আর্জি।

অর্থাৎ রঞ্জন-সাহেবকে বিয়ে করতে হবে – তার কন্যাকে। মহারাজকুমারী মণিমালাকে।

রঞ্জন-সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কন্যা আপনার সুন্দরী?

বিক্রমজিৎ বললে, আলবাৎ।

—বয়স?

—তেইশ।

নিয়ে আসুন এইখানে। অবিলম্বে। আমার গাড়ী নিয়ে চলে যান এক্ষুণি।

বলেই রঞ্জন-সাহেব ডাকলেন, কে আছিস?

বিক্রমজিতের মাথাটা তখন ঝিম ঝিম করছে। এমনও তো হতে পারে—শুনতে ভুল করেছে সে!

জিজ্ঞাসা করলে, কি বললেন আপনি রাজাসাহেব। রাজকুমারীকে নিয়ে আসতে হবে এখানে?

রঞ্জন-সাহেব বললেন, দোষ কি? বিয়ে এইখানেই হবে।

বিক্রমজিৎ উঠে দাঁড়ালো।

অনেক জায়গা থেকেই সে উঠে এসেছে এই রকম করে'।

রঞ্জন-সাহেব বললেন, উঠলেন কেন? গাড়ী ডাকবো?

বিক্রমজিৎ বাহাদুর বললে, না। আমার মেয়েকে বিয়ে করতে হলে আপনাকেই যেতে হবে আমার বাড়ীতে। আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু আমার শরীরে মহারাজার রক্ত বইছে এখনও।

রঞ্জন-বাহাদুর কি যেন ভাবলেন। বললেন, বসুন, বসুন, রাগ করবেন না। বসুন! আমাদের বংশের এই নিয়ম কিনা, তাই ও-কথা বলেছিলাম।

—কি কথা?

রঞ্জন-বাহাদুর বললে, বিয়ের সময় মেয়েরাই চিরকাল আসে আমাদের বাড়ীতে। আমরা যাই না।

বিক্রমজিৎ বললে, এখানে কিন্তু যেতে হবে।

রঞ্জন-সাহেব বললেন, যাব।

—যাবেন ?—বিক্রমজিৎ বললো।

রঞ্জন-সাহেব বললেন, কি করবো বলুন, আপনার মত একজন মহারাজার আদেশ অমান্য করি কেমন করে ? যেতে হবে।

বিক্রমজিৎ বললে, জিতা রহো বেটা! রাজ-রাজড়ার মর্যাদা আপনি বুঝেন। তাহ'লে শুনুন। এ-মাসে বিবাহের মাত্র তিনটি দিন আছে। সাত, সতেরো আর সাতাশে। এই তিনটি দিনের মধ্যে যে-কোনও একটি দিন আপনি বলে দিন। আমি ব্যবস্থা করিগে।

রঞ্জন-সাহেবের একজন মোসাহেব এসে দাঁড়িয়েছিল তাঁর পাশে। সে বলে উঠলো, তাহলে ঠিকুজি কুষ্ঠির মিল ইত্যাদি—

রঞ্জন-সাহেব বললেন, আমাদের ও-সব দরকার হয় না।

বিক্রমজিৎ বললে, তুমি যা জানো না সে-সম্বন্ধে কথা বলছো কেন? চুপ কর।

লোকটি কিন্তু চুপ করলে না। বললে, দেনা-পাওনার কথাটা তো হবে।

বিক্রমজিৎ বললে, সে-সব আমরা রাজায়-রাজায় বুঝে নেবো, তোমার কি হে ?

রঞ্জন-সাহেব তাকে থামিয়ে দিলেন। হাতের ইসারায় তাকে চুপ করতে বললেন।

বিক্রমজিৎ বললে, তাহলে কোন্ তারিখ—

কথাটা শেষ করার প্রয়োজন হলো না। রঞ্জন-সাহেব বললেন, সাতাশে তারিখটাই ঠিক রইলো। আপনার মেয়েকে বিয়ে করাব জন্যে আমি তাহ'লে ওই তারিখেই যাব। লোকজন বিশেষ কেউ যাবে না কিন্তু।

বিক্রমজিৎ বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বর্তমানে আমি একটু বিপন্ন হয়ে পড়েছি। রাজ্যের আয় একরকম নেই নেই বললেই হয়।

রঞ্জন-সাহেব তার অনুচরদের বললেন, ওঁর রাজত্বে যেতে হলে কোন্ দিক্ দিয়ে যেতে হয় সব জেনে নাও।

আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিক্রমজিৎ ফিরে এলেন প্রতাপগড়ে।

আয়োজন সুরু হলো মণিমালার বিবাহের।

রাজার সঙ্গে বিবাহ। আয়োজন চাই রাজকীয়।

জমিজমা বিক্রি করে কিছু টাকা সংগ্রহ করলে বিক্রমজিৎ। ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে' বাড়ীখানা সাজালে। সাজালে লাল নীল কাগজ কেটে কেটে শিকলি তৈরি করে।

হৈচৈ গোলমাল জাঁকজমক না হ'লে রাজকন্যার বিয়ে ফাঁকা ফাঁকা ঠেকবে। তাই বিক্রমজিৎ অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলে—রাস্তার ধারে গ্রামের বারোয়ারী চণ্ডীমণ্ডপে ঝুমুর নাচ হবে।

গ্রামের লোক বিক্রমজিৎকে ভালবাসে সবাই। কারও সঙ্গে তার কোনও বিরোধ নেই।

গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা তাকে সাহায্য করতে লাগলো।

বিয়ের দিন সারা গ্রামে মনে হলো যেন উৎসব সুরু হয়েছে। চারিদিকে লোকজন, হৈচৈ, গোলমাল!

চণ্ডীমণ্ডপে ঝুমুরের দল নাচগান সুরু করলে।

বিক্রমজিৎ পরমানন্দে সবাইকে আশীর্বাদ করতে লাগলো।—তোমরা আমার অনেক করলে। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন!

এইবার বিয়েটি চুকে গেলেই বাস্, বিক্রমজিতের ছুটি।

ছাতনাতলায় পুরোহিত বসে আছে শালগ্রাম শিলা নিয়ে। এখন বর এলেই হয়।

কিন্তু বর আর আসে না।

লগ্ন বয়ে যাচ্ছে।

এদিকে বরের দেখা নেই!

গ্রামের লোকজন সব ঘর-বার করছে।

রাজা আসবে বিয়ে করতে। দেখবার জন্যে সবাই উৎসুক।

গ্রামের বাইরে কয়েকজন ছোকরা দেখতে গিয়েছিল বর আসছে কিনা। তারাই এসে খবর দিলে, নদীর ওপারে বরের পাল্‌কি দেখা গেছে।

খবর পেয়ে অনেকে ছুটল বর দেখতে।

কিন্তু পাল্‌কির দরজা বন্ধ। দু'জন বরকন্দাজ আসছে পাল্‌কির সঙ্গে সঙ্গে। তারা পাল্‌কির দরজা কিছুতেই খুলতে দিলে না!

বল্লে পাল্কি যাবে একেবারে ছাতনাতলা পর্যন্ত। রাজার হুকুম।

তাই চলো!

বেয়ারারা পাল্কি নামালে ছাতনাতলায়।

কিন্তু এবার তো বরকে নামতে হয়!

বরকন্দাজ বললে, আজ্ঞে না, রাজা বাহাদুর বিয়ে করছেন গরীবের বাড়ীতে। লোকজনকে তিনি দেখা দিতে চান না। উনি থাকবেন পাল্কির ভেতরে।

গ্রামের কয়েকজন যুবতী মেয়ে— মণিমালার বন্ধু, এগিয়ে এলো পাল্কির কাছে। বরকন্দাজ দু'জনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললে, খুব হয়েছে! সরো!

তারপর এক হুলস্থূল কাণ্ড।

মেয়ে দুটো পাল্কির দরজা খুলতে গেল। বরকন্দাজ দুজন লাঠি নিয়ে এগিয়ে এলো।

গ্রামের ছোকরারা সহ্য করবে কেন? কোথাকার কে দু'জন লাঠিয়াল গায়ে হাত দেবে মেয়েদের?

রক্ত তাদের গরম হয়ে উঠলো। হৈ হৈ করে' এগিয়ে এলো ছেলে ছোকরার দল। 'মার্, মার্' রব উঠলো চারিদিকে। আর সেই হট্টগোলের মাঝে দেখা গেল, পাল্কির দোর খুলে হাত ধরে টেনে যাকে বের করা হয়েছে সে-লোকটা একটা বেঁটে বামন—রঞ্জন সাহেবের এক খানসামা।

ব্যাটা বর সেজে বিয়ে করতে এসেছে মণিমালাকে।

একটা মেয়ে তখন একগাছা ঝাঁটা নিয়ে এসে লোকটার মাথা থেকে পা পর্যন্ত এলোপাথাড়ি মেরে চলেছে আর বলছে, বিয়ে করবি? নে বিয়ে কর্!

আড়াই হাত লম্বা বামনটা তখন তিড়িং তিড়িং করে' লাফাচ্ছে আর বলছে, আর মেরো না, আর মেরো না, মরে যাব।

বেহারারা পাল্কি ছেড়ে ছুটে পালিয়েছে, আর বরকন্দাজ দু'জনের তো টিকি দেখা যাচ্ছে না!

বিক্রমজিৎ কোথায় ছিল কে জানে, এতক্ষণ পরে ছুটে এসে সেই বামনটাকে দু'হাত দিয়ে আগ্‌লে ধরে বললে, একে মেরো না তোমরা, ওর দোষ নেই, দোষ আমার।

—আরে, এ বলে কি? বলছে, দোষ আমার!

এই বলে গ্রামের নিতাই চৌধুরী হাত গুটিয়ে এসে বসলো ছাতনাতলায়।

খন্তা ডোম তিন-তিনটে ডাকাতির আসামী হয়ে দু'বার জেল খেটে সবে তখন গ্রামে এসেছে। নিষ্ফল আক্রোশে সে তখন মাটিতে তার হাত দুটো ঘষছিল আর বলছিল—হুকুম দেন বাবু, গায়ের চামড়াটা ওর তুলে দিই।

নিতাই বললে, তুলতে হলে এখন আমাদের পাগলা মহারাজার পিঠের চামড়া তুলতে হয়। উনি ওকে বুক দিয়ে আগলে বলছেন, দোষ ওর নয়, দোষ আমার।

খন্তা বললে, রঞ্জন-সাহেবকে চেনেন না বাবু? রঞ্জন-সাহেবের টাকা খেয়ে গিয়েছিলাম কোলিয়ারীর ঘোষ-সায়েবের বোনকে চুরি করে তুলে আনতে। মেয়েটা আমাকে বাবা বলে' ডেকে, সব দিলে মাটি করে'। থতমতো খেয়ে গেলাম। না পারলাম পালাতে, না পারলাম মেয়েটাকে তুলে আনতে। ঘোষ-সায়েব জানতে পেরে দিলে গুলি চালিয়ে। এই দেখুন বাবু ঘা শুকোতে তিনমাস লাগলো। ঘোষ-সায়েব ইচ্ছে করলে আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তার ওই বোন—যাকে আমি ধরে আনতে গিয়েছিলাম, সে-ই আমাকে বাঁচিয়ে দিলে। বললে, না, ওকে ছেড়ে দাও। সেই থেকে ও-সব কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি বাবু। রঞ্জন-সায়েব রেগে গিয়েছিল। বলেছিল, আমাকে দেখতে পেলে গুলি করে' মারবে, তাই আজ তার বিয়ের কথা শুনে দেখতে এসেছিলাম রঞ্জন-সায়েবকে।

নিতাই জিজ্ঞাসা করলে, দেখা হলে কি করতিস্?

খন্তা বললে, বিয়ে আমি হ'তে দিতাম না বাবু। রঞ্জন সায়েব লোক ভাল নয়।

বিক্রমজিৎ সেই বেঁটে বামুনটার নিরাপদে পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে এসে দাঁড়ালো ছাতনাতলায়। খন্তার কথাটা তার কানে যেতেই বললে, আমি জানতাম না বাবা, রঞ্জন-সায়েব আমাদের রাজবংশের কলঙ্ক।

নিতাই বললে, ব্যাটা পাজি নচ্ছারের একশেষ! এই খন্তাও জানে সেকথা।

বিক্রমজিৎ বললে, না বাবা, পাজি নচ্ছার বলিসনি। রাজ-রাজড়ার ছেলে কিনা, তাই ছেলেমানুষি এখনও যায়নি। নেহাৎ ছেলেমানুষ!

পুরোহিত বললে, এবার তোমার ওপর আমার রাগ হচ্ছে বিক্রম। তুমিও কি কম ছেলেমানুষ নাকি? এখন তোমার এই মেয়ে যে লগ্নভ্রষ্টা হ'তে বসলো, তার কি করবে কর। আজ বিয়ে না হলে আর কেউ ওকে বিয়ে করতে চাইবে না।

বিক্রমজিৎ বললে, সেও তো এক ভাবনার কথা। এখন রাজবংশের একটি ছেলে আমি পাই কোথায় ?

গ্রামের 'মুরুব্বি-মাতব্বর অনেকেই ছিল সেখানে। একজন রেগে উঠলো। বললে, ত্থাখো মহারাজ, তোমাকে আমরা ভালবাসি তাই বলছি। নিজের সর্বনাশ তো করেছ, এখন মেয়েটার সর্বনাশ আর কোরো না।

পুরোহিত বললে, সর্ব্বনাশের বাকি কি আছে বাবা ? উনি রাজবংশ ছাড়া আর কোথাও মেয়ের বিয়ে দেবেন না !

মুরুব্বি-মাতব্বরেরা অনেকেই এসেছিল। তাঁরা এবার রাগ করে উঠলেন। বললেন, তাহ'লে তাই দিন। আমরা চললাম। চলহে, চল।

অনেকেই চলে গেলেন, কিন্তু প্রিয়দর্শন এক যুবক দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে'।

রাসবিহারীবাবু গ্রামের একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। নাম-করা উকিল। যুবকটি তাঁরই ছেলে। সবে এই বৎসর আইন পাশ করেছে।

রাসবিহারী বাড়ী যাবার আগে ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, তুমি দাড়িয়ে রইলে কেন সোমনাথ, চল !

সোমনাথ চুপি চুপি ডাকলে, বাবা !

রাসবিহারীবাবু থামলেন।—কি বলছো ?

সোমনাথ বললে, বিক্রমজিৎ পাগল সেকথা সবাই জানে।

—হ্যাঁ, তা জানে বই-কি ! গ্রামের লোক সবাই জানে।

সোমনাথ বললে, আজ সেই সব গ্রামের লোক এখানে এসেছে কি জন্যে ? পাগলের পাগলামি দেখতে ?

রাসবিহারীবাবু বললেন, এ-সব কী যা-তা' বলছো তুমি ? তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ?

সোমনাথ বললে, বিক্রমজিৎ-মহারাজার মত পাগল হতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করতাম।

রাসবিহারীবাবু রাগ করলেন। বললেন, ছি ছি ছি, লেখাপড়া শিখে আজকালকার ছেলে তোমরা কি হ'লে শেষ পর্যন্ত !

—মানুষ হয়েছি বাবা। বলেই সোমনাথ হেঁট হয়ে তার বাবার পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে! বললে, অনুমতি দিন। আমি ওঁর মেয়েকে বিয়ে করবো।

রাগে এবার আর রাসবিহারীবাবুর মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। চেঁচিয়েও কিছু বলতে পারেন না। লোকজন শুনতে পাবে। থর্ থর্ করে' কাঁপতে লাগলেন তিনি। তারপর অতিকষ্টে উচ্চারণ করলেন, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করবো।

সোমনাথ খুশী হয়ে আবার একবার তার বাবাকে প্রণাম করবার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, বাবা কিন্তু তাকে সে-সুযোগ দিলেন না। হন্ হন্ করে' চলে গেলেন সেখান থেকে।

সোমনাথ এগিয়ে এলো পুরোহিতের কাছে। বললে, আমি বিয়ে করবো মনিমালাকে।

পুরোহিত বিশ্বাস করতে পারলে না সহজে। বললে, ডাকো তোমার বাবাকে ডাকো।

সোমনাথ বললে, বাবা আসবেন না। আমি তাঁর ত্যাজ্যপুত্র।

নিজেই কল্পনা করে নিন ঃ

কলকাতা শহরের বালিগঞ্জ অঞ্চলে তিনতলা বাড়ীর একখানি ঘর। চমৎকার সাজানো। দরজা জানলার মাপ ক'ফুট ক'ইঞ্চি, ঘরে ক'খানি চেয়ার, কি রকম টেবিল, জানলায় কি রঙের পরদা—সে-সব কথা নাই বা লিখলাম।

গ্রীষ্মকাল। ইলেকট্রিকের পাখা নিশ্চয়ই ঘুরছে।

সবে সন্ধ্যা। আকাশ বা চন্দ্র সূর্যের খবর এরা রাখে না। রাখলে আমাকে লিখতে হতো—পশ্চিম দিগন্ত রক্তবর্ণে রঞ্জিত। সূর্যদেব অস্তমিত হলেন।

সে-সব বলাই যখন নেই, ধরে নিন—ঘরে আলো জ্বলছে।

একজন যুবক, একজন যুবতী। মুখোমুখি বসে। ঘরে আর-কাউকে দেখা যাচ্ছে না। না না—লজ্জার কিছু নেই। স্বামী আর স্ত্রী। বসে বসে চা খাচ্ছে।

গল্পটা আরম্ভ হয়েছিল ভাল। কথা কইলেই নাটক জমে উঠতো।

কিন্তু কোথাকার, কে এক অরসিক—দিলে রসভঙ্গ করে।

খোলা দরজায় পর্দ্দা ঝুলছিল। পর্দ্দার ও-পার থেকে বলে উঠলো ঃ May I come in?

পুরুষ মানুষের গলার আওয়াজ।

চায়ের পেয়ালাটি হাতে নিয়ে যুবতী উঠে দাড়ালো। চট্ করে' একবার আড়চোখ দোরের দিকে তাকিয়ে, পাশের দরজা দিয়ে ও-ঘরে চলে গেল।

'May I come in' বলে আগন্তুকের উচিত ছিল জবাবের জন্য অপেক্ষা করা। কিন্তু তা সে করলে না। সটান্ ঢুকে পড়লো ঘরের ভেতর।

ঢুকেই বললে, চিনতে পারো শিশির?

তাহ'লে যুবতীর স্বামীর নাম শিশির।

শিশির বললে, বাঃ বেশ মানুষ যা হোক্! তোমার সঙ্গে কথা বলা উচিৎ নয়।

—বোলো না।

বলেই সে চেপে বসলো। বসেই বললে, কথা বলবে না ; কিন্তু চা এক পেয়ালা নিশ্চয়ই দেবে।

—হ্যাঁ, তা অবশ্য পেতে পারো। মতি ! মতি !

মতি চাকরের নাম।

বাইরে থেকে মতি বললে, জি, হুজুর !

—এক কাপ চা দিয়ে যা বাবা এখানে।

—যে-আজ্ঞে !

কথা কইবে না বলেও, কথা না বলে থাকতে পারলে না শিশির। বললে, তুমি আমাকে অত্যন্ত বিপদে ফেলেছিলে সমর।

আগন্তুকের নাম সমর। বললে, বিপদে ফেলেছিলাম ? আমি ?

শিশির বললে, হ্যাঁ তুমি। কাউকে কিছু না বলে তো পালালে বাড়ী থেকে। তোমার মা ডেকে পাঠালেন আমাকে। তিনি জানেন আমি তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, আমি নিশ্চয়ই জানি তোমার খবর। ভেবে ছাখো আমার তখন কি রকম অবস্থা। না পারি দাঁড়িয়ে থাকতে, না পারি পালাতে।

সমর বললে, কি করলে ?

শিশির বললে, মার ছু'চোখ তখন জলে ভরে এসেছে। আমি সেদিকে তাকাতে পারছি না, হেঁট মুখে দাড়িয়ে আছি, এমন সময় তোমার বোন্ অনিলা বললে, দাদার সঙ্গে কিন্তু টাকা আছে—দশ হাজার। ছোট একটা ব্যাঙ্কে মা'র ওই টাকাটা ছিল, দাদাই বললে ওটা বড় ব্যাঙ্কে রাখা উচিত। মা একটা বেয়ারার চেক্ দিলে দাদার হাতে। সে টাকা দাদা তুলেছে। বললাম, তবে আর ভাবছিস কেন ? সে বিলেত গেছে। আমি লিখে দিতে পারি। ঠিক তাই। পরের দিন তোমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম, তোমার টেলিগ্রাম এসেছে। টেলিগ্রামটা দেখলাম। তবু ভালো যে শেষের লাইনে লিখেছিলে, খবরটা শিশিরকে জানিয়ে দাও। তারপর এই সুদীর্ঘ—

সমর বললে, তিন বৎসর।

শিশির বললে, তিন বৎসর পরে এই তোমার প্রথম আবির্ভাব।

মতি চা না আনলে।

শিশির বসলে, তোমার মাকে বল, আজ ইনি এইখানে থাবেন, এইখানে থাকবেন।

সমর বললে, খেতে হবে, থাকতেও হবে ?

—নিশ্চয়। এতদিন পরে দেখা।

মতি বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

এইবার শিশির জিজ্ঞাসা করলে, একা ফিরলে, না কোনও সুন্দরী বিদেশিনীকে এনেছো সঙ্গে ?

সমর বললে, না। তখনও একাকী, এখনও একাকী। আচ্ছা হ্যাখো, আমি যখন এলাম, মনে হ'লো একটি মেয়ে বসেছিল তোমার পাশে, তিনি কি—

শিশির বললে, পরনারী ন'ন্—সহধর্মিনী। নীলিমা।

সমর বললে, আমি বিলেত যাবার কিছুদিন আগে সেই যে-মেয়েটিকে তুমি একবার দেখেই পছন্দ করেছিলে, এ কি সেই—

শিশির বললে, হ্যাঁ, ইনিই তিনি। তুমি চলে গেলে, আমি বিয়ে করলাম। আজ তিন বছর হ'লো। কিন্তু সত্যি বলতে কি ভাই এই তিন বছরের ভেতর একটি দিনের জন্যেও আমাদের—ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়নি।

সমর বললে, চমৎকার। লাভ-ম্যারেজ। কিন্তু এটা খুব ভাল লক্ষণ নয় শিশির, বৈচিত্র্যহীন নিতান্ত একঘেয়ে জীবন। আমি হ'লে এতদিন হয়ত মারামারি কাটাকাটি—শেষ পর্যন্ত ছাড়াছাড়িও হয়ে যেতে পারতো।

শিশির বললে, মেয়েদের সম্বন্ধে তোমাব কি এখনও সেই ধারণাই আছে নাকি সমর ?

সমর বললে, কোন্ ধারণা ?

শিশির বললে, সেই যে বিলেতে যাবার প্রায় মাসখানেক আগে হঠাৎ তুমি রব ধরেছিলে - মেয়েরা তোমার দু'চক্ষের বিষ। তাদের তুমি ঘৃণা কর।

সমর বললে, নিশ্চয়। সে ধারণা আমার কোনোদিন যাবে না। তোমরাই দিয়েছ মেয়েদের মাথাটি খেয়ে। নিজেদের প্রয়োজনে তোমরা ওদের খোসামুদি করেছো, পূজো করেছো, পায়ে ধরেছো, মাথায় তুলেছো—দেবী, বলেছো লক্ষ্মী! ওরা তার সুযোগ গ্রহণ করেছে।

শিশির বললে, এ-মত তোমার ইংলণ্ড আমেরিকা গিয়েও বদ্‌লালো না ?

সমর বললে, না বদলায়নি, বরং বেড়েছে। আমাদের দেশে ওরা ওদের দীনতা ঢেকে ঘোমটা টেনে অন্দর মহলে বসে থাকে, আর ওদের দেশে ওরা—কতটুকু ওদের দাম আর কি তাদের প্রয়োজন। তাই তারা তাদের সমগ্র দেহটিকে বেশে-বিন্যাসের সব সময়েই অনারৃত করে পুরুষের চোখের

সামনে তুলে ধরে রাখে। সোনালী রঙে ছাপা যেন ইনভিটেশন্ কার্ড! ওরা জানে যে ওরা সেক্স ছাড়া আর কিছুই নয়। **Vulger** sex!

নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে।

ভেজানো দরজায় দুটো কপাটের মাঝখানে একটু ফাঁক ছিল! এবার সে ফাঁক যেন আরও একটু বাড়লো। আর সেই ফাঁকের ওধারে এক যুবতী নারীর একজোড়া চোখ আর একজোড়া কান!

শিশির বললে, আমাদের দেশ কিন্তু তা নয় সমর। sex ছাড়াও মেয়েদের যে আর-একটা পৃথক সত্তা আছে—

সমর উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। বললে, আরে থামো! তোমার ও স্তুতিবাদ আমি শুনতে চাই না। মেয়েদের হাবভাব দেখলে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ঘৃণায় আমার সর্ব শরীর রি রি করতে থাকে। ওরা, স্বার্থের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি। তুমি যদি যেতে একবার বিলেতে, তাহ'লে তোমাকে আমি দেখিয়ে দিতাম—নারীর সত্যিকারের রূপ। বহু বিচিত্র বর্ণে চিহ্ন-বিচিত্রিত মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ!

পাশের দরজায় বেশ জোর শব্দ হলো। শিশির ও সমর দুজনেই সচকিত হয়ে সেইদিকে তাকালে।

শিশির চুপিচুপি বললে, সব শুনেছে!

সমর বললে, শুনবেনই তো!

বেশ জোরে জোরে মনে হলো যেন অন্তরালবর্তিনীকে শুনিয়ে শুনিয়েই সে আবার বললে, আড়ি পেতে শোনাই তো ওদের স্বভাব।

শিশির যেন ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে গেল। বললে, আঃ, আস্তে!

সমর বললে, আমার স্বভাবটা ঠিক তার উল্টো। কাজেই আস্তে বলা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।— আর এক পেয়ালা চা দিতে বল দেখি!

শিশির ডাকলে, মতি! মতি!

যে দরজায় শব্দ হয়েছিল, সেই দরজা খুলেই মতি এলো।

শিশির বললে, বাবুর জন্যে আর এক কাপ চা আনো। বাবু এখানে রাত্রে এখানে থাকবেন, সেকথা বলেছো তো?

মতি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেছি।

মতি চলে যেতেই সমর বললে, তোমার স্ত্রী আমার কথাগুলো শুনেছেন কিনা এইবার বুঝতে পারা যাবে। একটু অপেক্ষা কর।

.পকেট থেকে সিগারেট বের করে' সমর বললে, সিগারেট তুমি এখনও খাও না ?

শিশির বললে, না।

নিজে একটি সিগারেট ধরিয়ে বললে, বিয়ের পর সিগাবেটটা ধবলেই পারতে।

শিশির একটু হাসলে।

মতি ঘরে ঢুকলো। বললে, মা বললেন, চা হবে না। দোকান থেকে চা আনিয়ে খেতে বল। আর বললেন, মাসীমার বাড়ী যাবার কথা কি ভুলে গেছেন ?

সমর মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লে মুখ থেকে। তারপর সেই কুণ্ডলীপাকানো সাদা ধোঁয়াব দিকে তাকিয়ে বললে, হ'লো তা ? শুনলে ?

এতক্ষণ পরে নাটক বোধ হয় জমলো।

শিশির একটুখানি অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

নীলিমা যে এরকম কথা বলতে পারে তা সে ভাবে নি। বললে, দাঁড়াও, দাঁড়াও, মতি কি বলতে কি শুনেছে—

সমর বললে, মতি ঠিকই শুনেছে শিশির।

শিশির বললে, না না, তাহলে ও তোমার সঙ্গে একটু রসিকতা করেছে। আর ওই যে মাসীমার কথা বললে, ওটা সত্যি। আজ আমার এক শালীর ছেলেব অন্নপ্রাশন। আমাদের সেখানে যাবার কথা ছিল

সমর বললে, আজ আমি উঠি তাহলে। তোমরা যাও।

শিশির বললে, পাগল হয়েছ ? এতদিন পরে তোমাব সঙ্গে দেখা। আজ আমি তোমাকে ছাড়বো না। দাঁড়াও আসছি।

শিশির বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

মতি চলে যাচ্ছিল তার পিছু পিছু, সমর ডাকলে, শোনো! মতি!

মতি ফিরে এলো।

সমর: এখানে তুমি কতদিন চাকরি করছো ?

মতি: বছর খানেক হবে বাবু।

সমর: এ বাড়ীতে কে রান্না করে ? তোমার মা-ঠাকরুণ, না, ঠাকুর আছে ?

মতি ঃ ঠাকুর আছে বাবু। তবে ভাল রান্না করতে হলে মা নিজে রান্নাঘরে গিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে শুনিয়ে দেন।

সমর ঃ (পকেট থেকে পয়সা বের করে) এই নাও বাবা, কাছাকাছি কোনও দোকান থেকে এক পেয়ালা চা আনো চট্ করে'।

পয়সা নিয়ে মতি চলে গেল। সমর সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালে। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো ছবিগুলি দেখতে লাগলো। হঠাৎ যে-ছবিটার কাছে গিয়ে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে রইলো, এমন কি হাতের সিগারেটটা টানতে পর্যন্ত ভুলে গেল, সে ছবিটি নীলিমা দেবীর।

ঘরে ঢুকলো শিশির। সঙ্গে নীলিমা।

শিশির বললে, ওদিকে কি দেখছো? এইদিকে তাকাও। দু'জনের পরিচয় করিয়ে দিই।

সমর ফিরে দাড়ালো। বললে, পরিচয় আমাদের হয়ে গেছে। অতিথিকে যখনই উনি দোকান থেকে চা আনিয়ে খেতে বলেছেন, ওর পরিচয় আমি তখনই পেয়ে গেছি।

নীলিমা ঃ ওঁর পরিচয়ও আমি পেয়েছি। যার বাড়ীতে এসেছেন তাকেই যিনি স্বার্থপর, নীচ, ইতর বলতে পারেন তার আর নতুন করে' পরিচয়ের দরকার হয় না।

সমর এগিয়ে এসে একটা সোফায় চেপে বসলো। বললে, দেখুন, এই ইতর' বিশেষণটা আমার মনে ছিল না। ওটা যে আপনি নিজেই প্রয়োগ করলেন, তার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

শিশির ঃ আরে, তোমরা দুজনে ঝগড়া শুরু করলে যে!

সমর ঃ ওঁদের সঙ্গে তো আমার ঝগড়ার সম্পর্ক। মেয়েদের সঙ্গে চিরকাল ঝগড়া করেছি, আজও করবো।

মতি দোকান থেকে চা এনে পেয়ালাটি সমরের হাতের কাছে নামিয়ে দিলে।

নীলিমা ঃ চা কি দোকান থেকেই এলো?

সমর ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ। বাড়ীতে যার সব থেকেও কিছু থাকে না, বাইরের আশ্রয় তাকে নিতেই হয়।

নীলিমা ঃ আপনার হেঁয়ালী বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। (শিশিরকে) দিদির বাড়ী যাবার কি হবে?

শিশির ঃ তুমি গেলে আজ আর ফিরতে পারবে না।

নীলিমা ঃ কেন ?

শিশির ঃ কিছুতেই ছেড়ে দেবে না। তার চেয়ে গাডীটা নিয়ে আমি নিজেই একবার চট্ করে ঘুরে আসি।

নীলিমা ঃ আর আমি ?

শিশির ঃ তোমরা ততক্ষণ ঝগড়া কর। বোসো সমর, আমি যাব আর আসবো। এসে যেন আমাকে পুলিশ না ডাকতে হয় !

সমর ঃ আমাকে তুমি শত্রুপুরীতে রেখে যাচ্ছ শিশির মনে থাকে যেন।

শিশর ঃ শত্রুপক্ষ অবলা। পরাজয়ের আশঙ্কা কম। এই বলে' শিশির সত্যিই চলে গেল।

সমর ঃ (নীলিমাকে) শুনলেন ?

নীলিমা ঃ শুনেছি।

সমর ঃ এবার তা'হলে যুদ্ধং দেহি !

নীলিমা ঃ জিততে পারবেন ?

সমর ঃ নিশ্চয়ই পারবো।

নীলিমা ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে নারী পুরুষকে হারিয়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্তও ইতিহাসে আছে।

সমর ঃ আছে। কদাচিৎ। খুব কম। তার চেয়ে যা সর্ববাদীসম্মত তা হচ্ছে এই যে সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী পুরুষেব বশ্যতা স্বীকার করেছে। প্রকৃতির এই নিয়ম।

নীলিমা ঃ ভুল ব্যাখ্যা করেছেন আপনারা। বন্ধুত্বেব নাম দিয়েছেন বশ্যতা। তাই নারী আপনাদের বন্ধু না হয়ে দাসী।

সমর ঃ দাসী না করে' নারীকে যে-দেশ বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছে সে দেশও আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম।

নীলিমা ঃ কি দেখলেন ?

সমর ঃ দেখলাম আজ যে বন্ধু, কাল সে-ই হয়েছে পরম শত্রু। গৃহ সেখানে একরকম নেই বললেই হয়।

নীলিমা ঃ গৃহ কি আপনাদের এখানে আছে ?

সমর ঃ নিশ্চয়ই আছে। রাখলেই আছে। আসল কথাটা কি জানেন ?

নীলিমা ঃ জানালে বাধিত হব।

সমর: আপনারা প্রচার করে এসেছেন যে ছন্নছাড়া পুরুষদের নিয়ে ঘর বাঁধাই নাকি আপনাদের সহজাত কামনা এবং সাধনাও। কিন্তু—

নীলিমা: থামলেন কেন?

সমর: আসল কথাটা ঠিক উল্‌টো। ঘর ভাঙ্গাই আপনাদের খেলা। নেশাও।

নীলিমা: সব মেয়েই কি তাই?

সমর: হ্যাঁ। অন্ততঃ আমার কাছে।

নীলিমা: মিষ্টার চৌধুরী!

সমর: মিসেস্ সেন! আমার দোষ নেই মিসেস্ সেন। শুনতে আপনিই চেয়েছিলেন। সত্যি কথা সব সময় মিষ্টি শোনায় না। তবু ক্ষমা চাইছি।

নীলিমা: আমিও।

সমর: গৃহ এখানে নেই বললে শুনবো কেন? এই চমৎকার গৃহ।

নীলিমা: থাক্ আর জখমের ওপর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে না।

সমর: না, অত দয়ামায়া আমার নেই। আপনারা দু'জন--বিয়ের আগে দু'জনকে ভালবেসেছেন, চিঠিপত্র লিখেছেন, তারপর এই তো বেশ দুটিতে—কি বলবো? ভাল বাংলা করে' বলতে হ'লে বলতে হয়—পরমানন্দে একটি সুখনীড় রচনা করেছেন।

নীলিমা: থাক্ আর কবিত্ব করবেন না। বিয়ের আগে, কে বললে আপনার বন্ধুকে আমি চিঠিপত্র লিখতাম?

সমর: আমার বন্ধু আমাকে সে চিঠি দেখিয়েছে।

নীলিমা: তা তো দেখাবেই। পুরুষেরা বিশ্বাসঘাতক।

সমর: আবার উল্‌টো কথা বলছেন।

নীলিমা: শুধু বিশ্বাস-ঘাতক নয়—ভণ্ড। এই যে আপনি নিজেকে নারীবিদ্বেষী বলে প্রচার করেন, ওটা আপনার মনের কথা নয়।

সমর: প্রচার করি? আমি ভণ্ড?

নীলিমা: হ্যাঁ।

সমর: চোখে এখন আপনার রঙীন চশমা। ভুল দেখছেন। নিজের মতন দেখছেন হয়তো।

নীলিমা: মিষ্টার চৌধুরী, আপনি ভুলে যাচ্ছেন—

সমর: কি? কি ভুলে যাচ্ছি?

নীলিমা : না থাক্। আমি আসছি।

সমর : যুদ্ধ আরম্ভ হতেই শত্রুর পলায়ন! মতি! মতি!

মতি : যাই হুজুর!

সমর : মতি, বাবা, আর এক পেয়ালা চা। এই নাও পয়সা।

মতি : যে-আজ্ঞে।

নীলিমা : মতি!

মতি : আপনি ডাকছেন মা?

নীলিমা : হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছ?

মতি : বাবুর চা আনতে।

নীলিমা : না। তোমার ও-বাবু এখন চা খাবেন না। পয়সা রাখো।

মতি : যে-আজ্ঞে।

সমর : কিন্তু চা আমি খাবোই।

নীলিমা : না।

সমর : হুকুম?

নীলিমা : হ্যাঁ।

সমর : মনি না আমি কারও হুকুম। চা আমাকে খেতেই হবে।

নীলিমা : খুব বীরপুরুষ! চাকরের সামনে অপমানটা আর নাই-বা করলেন! মতি! যাও তুমি। ওঁর খাবার হয়ে গেছে।

সমর : খাবার? কার?

নীলিমা : আপনার।

সমর : আমি খাব না।

নীলিমা : দোকান থেকে চা আনতে বলেছিলাম বলে?

সমর : আরও অনেক কিছু বলেছেন।

নীলিমা : তবু খেতে হবে।

সমর : না।

নীলিমা : হাঁ।

সমর উঠে দাঁড়ালো। চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললে, শিশরকে বলবেন কাল যেন সে আমার বাড়ী যায়। চললাম।

নীলিমা : (এগিয়ে গিয়ে) মিষ্টার চৌধুরী!

সমর : না।

নীলিমা ঃ (পথ আগলে) এভাবে যেতে আপনি পাবেন না।

সমর ঃ আমি যাবই।

নীলিমা ঃ যেতে আমি দেবো না।

সমর ঃ দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ান মিসেস্ সেন !

নীলিমা ঃ আপনাকে খেয়ে যেতেই হবে।

সমর ঃ না। মেয়েদের অপমান সহ্য করা আমার স্বভাব নয়।

নীলিমা ঃ আমি আপনাকে অপমান করেছি ?

সমর ঃ নিশ্চয় করেছেন।

নীলিমা ঃ তার জন্য ক্ষমা চাইছি। যাবেন না।

সমর ঃ যেতে দেবেন না ?

নীলিমা ঃ না।

সমর ঃ কেন আমাকে ধরে রাখছেন বলুন তো ?

নীলিমা ঃ আমার খুসী।

সমর ঃ আপনি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তা না হ'লে আপনাকে আমি ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চলে যেতাম।

নীলিমা ঃ যেতে হলে আমাকেও ঠেলে ফেলে দিয়েই যেতে হবে।

সমর ঃ ওঃ, আচ্ছা, আপনিই জয়ী হলেন।

নীলিমা ঃ চলুন তাহ'লে। বসুন।

সমর ঃ একটি মেয়ের কাছে জীবনে এই আমার প্রথম পরাজয়।

নীলিমা ঃ পরাজিত শত্রুর জন্যে এবার তা'হলে খাবার আনি।

সমর ঃ তার আগে চট্ করে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই।

নীলিমা ঃ করুন বন্দী রাজাধিরাজ !

সমর ঃ আপনি কি শিশিরকে সুখী করতে পেরেছেন ?

নীলিমা ঃ বেয়াদবি প্রশ্ন। তবু জবাব দিতে হবে। অন্যের মনের কথা আমি জানি না।

সমর ঃ বেশ তবে নিজের মনের কথাই বলুন। শিশিরকে পেয়ে আপনি সুখী হয়েছেন ?

নীলিমা ঃ তা জেনে আপনার লাভ ?

সমর ঃ লাভ না থাক, লোকসানও নেই।

নীলিমা ঃ অনধিকার চর্চ্চা করবেন না। জবাব দেবো না। মতি ! মতি !

মতি : যাই মা।

•নীলিমা : বাবুর খাবার দিয়ে যেতে বল।

মতি :•খাবার নিয়ে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছে মা। কোথায় দেবে ?

নীলিমা : এই যে এই সামনেই টেবিলে দাও। হ্যাঁ, ওইখানে। উনি বিলেত-ফেরত মানুষ, টেবিলে খাওয়াই অভ্যেস। বসুন।

সমর : শেষ পর্যন্ত বসাবেন।

নীলিমা : আর কত খোসামুদী করবো ?

সমর : বেশ তাহ'লে আরম্ভ করি। কিন্তু দেখুন, ওদেশে কিন্তু এ নিয়ম নেই।

নীলিমা : কি নিয়ম ?

সমর : একজন খাবে, আর একজন বসে বসে খাওয়া দেখবে, এ চলে না। একসঙ্গে বসে খেতে হয়।

নীলিমা : খাওয়ার চেয়ে খাইয়ে আমরা বেশী আনন্দ পাই। ও দেশের মেয়েরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত। যাক্‌গে সে কথা। একটা কথা মনে পড়লো। জিজ্ঞাসা করবো ?

সমর : করুন।

নীলিমা : বিয়ে কি আপনি করবেন না ভেবেছেন ?

সমর : যদি বলি করবো না !

নীলিমা : কোনও মেয়ে কি আপনাকে প্রতারণা করেছে ?

সমর : করেছে।

নীলিমা : এমন মেয়ে খুঁজলে পাবেন যে আপনাকে ভালবাসবে।

সমর : কি হবে মেয়েদের ভালবাসা পেয়ে ?

নীলিমা : ও-বস্তু থেকে যিনি বঞ্চিত, তাঁকে বোঝাবো কেমন করে ?

সমর : তবে আর মিছে কষ্ট নাই-বা করলেন ?

নীলিমা : এইটুকু বলতে পারি—কোনও মেয়ের ভালবাসা পেলে আপনার চোখে পৃথিবীর রং যাবে বদলে। বেঁচে থেকে আনন্দ পাবেন।

সমর : সে আনন্দ আপনি কোনদিন পেয়েছেন ? না, কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছেন ?

নীলিমা : সব কথাতেই আমাকে টানছেন কেন ?

সমর : যদি আঁকড়ে ধরে কূলে উঠতে পারি—এই আশায়।

(শিশির ফিরে এলো)

শিশির : এই যে দেখছি বেশ জমিয়েছ তোমরা।

সমর : এরকম জানলে স্ত্রীকে একা রেখে যেতে না নিশ্চয়ই।

শিশির : না, তা নয়। যেরকম মধুর আপ্যায়নে তোমাদের পরিচয় পৰ্ব্ব স্থরু হলো, ভেবেছিলাম ফিরে এসে পুলিশ ডাকতে হবে। তা—মিটলো কেমন করে ?

নীলিমা : হাতে পায়ে ধরে।

শিশির : কে ধরলে ?

সমর : যদি বলি—আমি।

শিশির : বিশ্বাস করবো না।

নীলিমা : ও কি ? খাওয়া হয়ে গেল।

সমর : হ্যাঁ।

শিশির : মতি ! যাও বাবুকে বেসিনটা দেখিয়ে দাও গে।

সমর : হ্যাঁ বাবা, চল্। (চলে গেল)

শিশির : রাত্রে সমরকে থাকতে বলেছি, কোন্ ঘরে ব্যবস্থা করবে ?

নীলিমা : কোনও ঘরেই না।

শিশির : তার মানে ?

নীলিমা : মানে অত্যন্ত সোজা। আমি চাই না উনি রাত্রে এখানে থাকেন।

শিশির : কথাটা আমি বলবো কেমন করে ?

নীলিমা : সে ভার আমার। তুমি যেমন অনুরোধ করবার তেমনি করবে।

সমর : দারুণ খাওয়া হয়ে গেছে। গৃহকর্ত্রীকে ধন্যবাদ। এবার একটু শোয়াব জায়গা পেলেই হয়।

শিশির : কোন্ ঘরে ব্যবস্থা করবে ?

সমর : দূরে ঠেলে দিও না। ইংলণ্ড-আমেরিকার অনেক মজার মজার গল্প আছে। মিসেস্ সেনকে তা থেকে বঞ্চিত কোরো না।

নীলিমা : মতি ! ড্রাইভারকে খাইয়ে দে বাবা।

শিশির : তোমার দিদি তাকে খাইয়ে দিয়েছে।

নীলিমা : বেশ তাহ'লে গাড়ীটা বের করতে বল।

শিশির : এখন গাড়ী কি হবে ?

নীলিমা ঃ আমি বেরুবো।

শিসির ঃ কোথায় ?

নীলিমা ঃ মিষ্টার চৌধুরীর সঙ্গে।

সমর ঃ আমার সঙ্গে ?

নীলিমা ঃ হ্যাঁ, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবো আর আপনার বাড়ীটা চিনে আসবো।

সমর ঃ বুঝেছি। বেশ তাহ'লে ওঠা যাক্।

নীলিমা ঃ হ্যাঁ, উঠুন। (শিশিরকে) তুমিও আসতে পারো আমাদের সঙ্গে।

শিশির ঃ তাহ'লে সত্যিই তুমি যাবে ?

নীলিমা ঃ মিথ্যা বলছি না।

সমর ঃ তুমিও এসো শিশির, মেয়েদের অতটা বিশ্বাস কোরো না।

নীলিমা ঃ বিশ্বাস না করে' আপনার বন্ধুর বোধ হয় আর উপায় নেই মিষ্টার চৌধুরী।

(তিনজনেই এলো গাড়ীর কাছে। ড্রাইভার দাঁড়িয়েছিল)

নীলিমা ঃ ড্রাইভার, তুমি থাকো বাড়ীতে। (শিশিরকে) তুমি গাড়ী চালাও। আমরা দু'জনেই পেছনে বসবো।

সমর ঃ পেছনে বসবো ? শিশির ড্রাইভারের মত একা ড্রাইভ্ করবে ?

নীলিমা ঃ হ্যাঁ। সেজন্যে আপনার চিন্তার কোনও কারণ নেই। বসুন।

(গাড়ী চালাচ্ছে শিশির। চৌরঙ্গীর ওপর গাড়ী গেল বন্ধ হয়ে। চালাবার অনেক চেষ্টা করলে। গাড়ী থেকে নেমে বনেট্ তুলে অনেকক্ষণ ধরে কি সব করলে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না।)

নীলিমা ঃ তেল আছে তো গাড়ীতে ?

শিশির ঃ আছে।

নীলিমা ঃ তাহ'লে এখন উপায় ?

সমর ঃ একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি।

নীলিমা ঃ তা যাবেন বইকি ! আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে যেতে পারবেন ?

সমর ঃ সরি ! সে-কথা ভাবিনি। আপদ বিদেয় করতে চাচ্ছিলেন কিনা, তাই যত তাড়াতাড়ি পারি নিজেই বিদায় হয়ে যাচ্ছিলাম।

নীলিমা : চাইলে কি হবে, man proposes God disposes ! নিন্ ডাকুন ট্যাক্সি ! আপদ বাড়ীতেই চলুক্। সেই ট্যাক্সিতেই ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিই।

শিশির : সেই ভালো। তোমরা বাড়ীতেই ফিরে যাও। মেয়েদের কথা আবার শোনে !

সমর : খুব দেরীতে বুঝলে। এই ট্যাক্সি ! দাড়াও। (ট্যাক্সি দাঁড়ালো। নীলিমা আর সমর চড়ে বসলো। শিশির রইলো গাড়ী আগলে বসে।)

(শিশিরের বাড়ী)

নীলিমা : (গাড়ী থেকে নেমে) মতি ! ড্রাইভারকে এই গাড়ীতে পাঠিয়ে দাও। গাড়ী খারাপ হয়ে পড়ে আছে চৌরঙ্গীতে।

ড্রাইভার : (তাড়াতাড়ি এসে) বাবু কি—

নীলিমা : হ্যাঁ, বাবু তোমার গাড়ী আগ্‌লে বসে আছেন। নামুন মিষ্টার চৌধুরী !

সমর : আমি আর কি জন্যে নামবো ? এই গাড়ীতেই আমি চলে যাই।

নীলিমা : না। আপনাকে নামতে হবে। ড্রাইভার, এই নাও, এই দশটা টাকা তোমার কাছে রাখো। যদি ওখানে দরকার হয়।

ড্রাইভার : কিছু দরকার হবে না মা। এ্যাক্সিলেটারের তারটা ছিঁড়ে গেছে। ওটা কাল একবার ছিঁড়েছিল। আমি গিয়েই ঠিক করে' দিচ্ছি।

নীলিমা : ট্যাক্সির ভাড়া দিতে হবে তো ! রাখো, নোটখানা। আসুন মিষ্টার চৌধুরী !

(সমর নামলো গাড়ী থেকে। নীলিমার সঙ্গে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল। গাড়ী ছেড়ে দিলে।)

নীলিমা : আমি তাড়াবার চেষ্টা করলে কি হবে ! রাত্রিবাস আজ এখানে আপনাকে করতে হ'লো।

সমর : আপনি কি ভয় পেয়ে আমাকে তাড়াবার চেষ্টা করছিলেন ?

নীলিমা : না। অপরাধ যে করেনি, তার আবার ভয় কিসের ?

সমর : তবে ?

নীলিমা : পুরানো কথা উঠুক্ সেটা আমি চাই না। বসুন। আসছি।

সমর : নীলা ! নীলা !

নীলিমা : (ফিরে দাঁড়িয়ে) কে নীলা ?

সমর : চেনো না নীলাকে ?

নীলিমা : না। নীলা মরে গেছে! আমি নীলিমা।

সমর : আমি কিন্তু চিনতাম ওই নামের একটি মেয়েকে।

নীলিমা : চিনতেন চিনতেন—তাতে আমার কি? যে চলে গেছে, যে মরে গেছে তাকে মনে রেখে আপনারই বা কি লাভ? ভুলে যান তাকে। মুছে ফেলুন মন থেকে।

সমর : ভুলে যাওয়া এতই সোজা? ভুলে যাওয়ার মত কাজ সে করে নি।

নীলিমা : কি করেছিল সে?

সমর : তাই তো বলছি। শুনুন। প্লিজ!

নীলিমা : বলুন। শুনছি।

সমর : নীলাকে ভালবাসতো একটি ছেলে। প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। ঠিক হলো তারা বিয়ে করবে। ছেলেটির মা কিন্তু এ বিয়েতে রাজি ছিল না। ছেলেটির বাবা নেই। সমস্ত সম্পত্তি আর টাকাকড়ি তার মার হাতে। মার অমতে যদি সে বিয়ে করে, মা বললে, কিছুই সে পাবে না। ছেলেটি তখন কি ঠিক করলে জানেন?

নীলিমা : কি ঠিক করলে?

সমর : নাটক-নভেলের নায়ক-নায়িকারা যা করে থাকে। নাই-বা পেলে ঘরে ঠাঁই! বিয়ে তারা করবেই।

নীলিমা : তারপর?

সমর : ছেলেটির ইচ্ছে ছিল সে বড় হবে, ইয়োরোপ যাবে পড়তে। নীলার প্রেমের জন্য সব কিছু বিসর্জ্জন দিয়ে দিন কয়েকের জন্যে সে দিল্লী গেল সরকারী একটি চাকরির খোঁজ পেয়ে। ঠিক রইলো ফিরে এসেই বিয়ে করবে। ফিরে সে এলো। দেখা করলে নীলার সঙ্গে। বললে, আমি এসেছি নীলা! নীলা জিজ্ঞাসা করলে, পেয়েছো পেয়েছো সে চাকরিটা? 'না' কথাটা বলতে তার কষ্ট হচ্ছিল, তবু সে সত্য কথাই বললে। বললে, তুমি ভেবো না নীলা, চাকরি একটা পাবোই। নাই-বা হলো মোটা মাইনে! আমরা মোটে দুটি প্রাণী! অভাব অভিযোগ আমাদের ভালবাসা দিয়ে—। কথাটা নীলা তাকে শেষ করতে দিলে না। বললে, যাক্ সমর, আমি দুদিন ভেবে দেখি। ভেবে কি দেখবে নীলা? পরশু আমরা বিয়ে করবো। নীলা বললে, না, এ হয় না। কি হয় না? বিয়ে? নীলা বললে, হ্যাঁ। আমি মনস্থির করে ফেলেছি। সমর বললে, এখনও দু'মাস হয়নি আমি দিল্লী গিয়েছিলাম, এরই

মধ্যে কি এমন ঘটলো যার জন্যে তুমি বলছো আমাদের বিয়ে হবে না ? নীলা বললে, তুমি বুঝতে পারছো না সমর, এমন করে দুঃখকে ডেকে এনো না। সমর বললে, আমি বড় হব, আমি একদিন অনেক টাকা উপার্জ্জন করবো নীলা তুমি বিশ্বাস কর, কিন্তু বিশ্বাস করতে সে পারলে না। উবে গেল তার এতদিনের ভালবাসা। বললে তুমি যাব সমর, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত স্থির হয়ে গেছে আমার। কোথায় ? কোথাকার রাজপুত্র সে ? নীলা বললে, বিয়ের দিন তোমায় নিমন্ত্রণ করবো। এসো। সমর তখন ভেঙ্গে পড়েছে। বললে, মস্ত বোকা আমি তাই তোমার মত মেয়েকে ভালবেসেছিলাম। বিশ্বাস করেছিলাম তোমার ভালবাসায়। তোমরা সব পার নীলা, টাকাই তোমাদের কাছে সব। বেশ, পারি যদি কোনোদিন তো টাকা দিয়েই কিনবো তোমাকে। এই বলে সমর চলে গেল।

নীলিমা : গল্প শেষ হ'লো ?

সমর : হ'লো। এর এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

নীলিমা : অস্বীকার করছি না। এখন কি করতে চাও তুমি ?

সমর : যদি বলি শোধ নিতে চাই।

নীলিমা : আমার স্বামী তোমার বন্ধু।

সমর : তাই বোধ হয় ওর বাধে নি।

নীলিমা : এ সবের সে একবর্ণও জানতো না।

সমর : জানিয়ে দেবো ?

নীলিমা : পারবে ?

সমর : নিশ্চয় পারবো।

নীলিমা : বিলেত থেকে কি এই বিদ্যেটা শিখে এলে নাকি ? এই ব্লাক্-মেলিং ?

সমর : না ও-বিদ্যে শিখতে বিলেত যাবার দরকার হয় না। নিজের লোভের ওপর দুনিয়ায় আর কোথাও কিছুই নেই সে কথাটা তোমার মত একটি মেয়ের কাছ থেকেও মানুষ শিখতে পারে।

নীলিমা : তোমার বন্ধুকে আঘাত দিতে তোমার বাধবে না ?

সমর : আমাকে আঘাত দিতেও তো কারও বাধে নি।

নীলিমা : তাই করো। বাধা দেবো না। (চলে যাচ্ছিল)

সমর : নীলা !

নীলিমা : মিসেস্ সেন বলতে যদি একান্তই অসুবিধে হয় তো নীলিমা দেবী বলে ডেকো।

সমর : আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানো ? মনে হচ্ছে, মেয়েদের কাছে ভালবাসাটা কিছুই নয়। আমাদের মত বোকা, যারা ফুলস্ তারাই শুধু ভালবেসে মরে।

নীলিমা : খুব ভাল একটি মেয়ে আমি দেখে দিচ্ছি, বিয়ে কর।

সমর : তুমি থামো। আমারও চোখে আছে। মেয়ে আমিও দেখে নিতে পারি।

নীলিমা : বেশ তবে শোওগে যাও। মতি, পূবের ঘরে বাবুর বিছানা পাতা আছে। বাবুকে নিয়ে যাও।

মতি : আসুন বাবু।

নীলিমা : শোন্ মতি, বাবু শুয়ে পড়লে সবুজ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে আসবি।

সমর : মনে আছে দেখছি।

নীলিমা : হ্যাঁ। সকালে আটটার আগে বাবুর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ো না। গরম চা এক কাপ হাতে নিয়ে গিয়ে বাবুকে ডেকে তুলো।

মতি : বেশ মা।

(শিশির এলো। এসেই সে তার ঘরে গিয়ে ড্রয়ার খুলে কি যেন খুঁজতে লাগলো।)

নীলিমা : গাড়ী ঠিক হ'লো ?

শিশির : হ্যাঁ, কি একটা তার ছিঁড়ে গিয়েছিল।

নীলিমা : এসেই ওখানে কি খুঁজছো ?

শিশির : সমরের চিঠি একখানা। রাস্তায় হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এই যে, পেয়েছি। (চিঠিটা হাতে নিয়ে) কোথায়, সমর ঘুমুলে নাকি ?

সমর : না, ঘুমোই নি। গাড়ী ঠিক হ'লো ?

শিশির : হ্যাঁ, হ'লো। রোজই ভাবি গাড়ীর মেকানিজমটা শিখে নেবো, কিন্তু হয়ে ওঠে না। এই নাও (চিঠিখানা দিয়ে) তোমার এই চিঠিখানা অনেকদিন থেকে পড়ে আছে আমার কাছে। তোমার কোন অনিলা তার বিয়ের রাতে আমাকে দিয়েছিল তোমাকে দিয়ে দেবার জন্যে। তুমি তখন বিলেতে। ভাগ্যিস মনে পড়লো, নইলে কাল আবার ভুলে যেতাম। আচ্ছা ভাই চলি, ঘুমোও, রাত অনেক হয়েছে।

(শিশির চলে গেল। সমর চিঠিখানা হাতে নিয়ে উঠলো। সবুজ আলোটা নিবিয়ে সাদা আলোটা জাললে। চিঠিখানা চোখের সামনে তুলে ধরলে।)

সমর : অনিলা দিয়েছে ? এ যে দেখছি নীলার হাতের লেখা। অনিলাকে লিখছে—আমার বিলেত যাবার আগে! (চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগলো) তোর দাদার মত তুইও ভুল বুঝিসনি ভাই। সমরকে বলতে পারিনি, তোকে বলছি। ওকে আমি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি অনিলা। ও ভাল ছেলে। ইউনিভার্সিটির রত্ন। ও বড় হবে। বিলেত যাবে। বিখ্যাত হবে। সে পথ বন্ধ করে দিয়ে ওর পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে, সামান্য একটি চাকরি নিয়ে নিতান্ত দরিদ্রের মত জীবন কাটাতে বাধ্য করবো আমি—আমার নিজের স্বার্থে—তা আমি পারিনি ভাই। তাই আঘাত দিয়ে—অপমান করে ওকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কি করে যে পেরেছি তা আমি নিজেই জানি না।

সমর : (আপন মনে) এ-কথা তুমি আমাকে বললে না কেন নীলা? এ তুমি কি করেছো? (আবার চিঠি পড়তে লাগলো) আর একটা কথা অনিলা, কাউকে বলিসনি যেন। তোদের মা একদিন এসেছিলেন আমার কাছে চুপিচুপি। কেঁদে ভিক্ষে চেয়েছিলেন তাঁর ছেলেকে। মা একদিন আমরা সবাই হব—সেই সেদিনের কথা মনে করে—বুঝে নিস অনিলা। মাপ্ করিস আমাকে। আর আমি লিখতে পারছি না।

সমর : (চিঠিখানা দলা পাকিয়ে নিজের দৃঢ় মুষ্টির মধ্যে চেপে ধরে) ছি ছি, এ তুমি কি করলে, কি করলে নীলা! (অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। মনে হ'লো তার বুকের ভেতর যেন ঝড় উঠেছে। —কখন সকাল হয়ে গেছে। মতি চা দিয়ে গেল। চায়ের কাপটি হাতে নিয়ে) মতি! তোমার বাবুর ঘুম ভেঙ্গেছে ?

মতি : অনেকক্ষণ। রোজ ভোরে উনি গাড়ী নিয়ে যেমন বেরিয়ে যান আজও তেমনি বেরিয়ে গেছেন।

নীলিমা : (বাইরে থেকে) কার সঙ্গে কথা বলছিস মতি?

মতি : বাবুর সঙ্গে।

নীলিমা : বাবু উঠেছেন? (ঘরে ঢুকে) যাও মতি, তুমি বাজারে যাও। (মতি চলে গেল। সমর একদৃষ্টে নীলিমার দিকে তাকিয়ে রইলো) ও কি! অমন হাঁ করে তাকিয়ে দেখছো কি?

সমর : তোমাকে দেখছি।

নীলিমা : নতুন দেখছো নাকি ?

সমর : হ্যাঁ নতুনই দেখছি। এ রূপ তোমার আমি কখনও দেখিনি। না না যেয়ো না। দেখতে দাও।

নীলিমা : তোমার হ'লো কি সমর ?

সমর : কি হ'লো নিজেও ঠিক বুঝতে পারছি না। —সদ্যস্নাতা, আলুলায়িত কুন্তলা, পরণে গৈরিক পট্টবাস, সিঁথিতে সদ্য আঁকা সিন্দুর রেখা, কণ্ঠে জড়ানো বস্ত্রাঞ্চল, অলক্তকরঞ্জিত নগ্ন পদযুগল—

নীলিমা : থামো থামো, হাসি পাচ্ছে। কবি হ'লে কবে থেকে ?

সমর : না না সত্যি এ রূপে তোমাকে আমি—

নীলিমা : পূজো করছিলাম ঠাকুর-ঘরে।

সমর : পূজো ? কর নাকি ? কার কল্যাণে ? শিশিরের ?

নীলিমা : তোমারও।

সমর : মিছে কথা।

নীলিমা : ঠাকুর দেবতা নিয়ে হিন্দুর মেয়ে মিছে কথা বলে না। সমর !

সমর : নীলা !

নীলিমা : কাল তুমি বলেছিলে মেয়েরা রহস্যময়ী, মেয়েরা হেয়ালি। একদিন বলেছিলে, টাকা দিয়ে নীলাকে কিনে নেবে। পারবে ?

সমর : না। ও-কথা বলে আমাকে আর লজ্জা দিও না নীলা।

নীলিমা : যে-নীলা তোমার ভালবাসার দাম দেয়নি, যে তোমাকে ঠকিয়েছে, কেন তুমি তাকে ভুলে যাবে না সমর ? কেন মুছে ফেলছো না মন থেকে সেই স্বার্থসর্বস্ব মেয়েটাকে ? পৃথিবীতে আরও অনেক মেয়ে আছে।

সমর : না। নীলা বোধহয় একটাই আছে।

নীলিমা : পাগল হলে নাকি ?

সমর : হইনি এখনও। তবে হতেও আর দেরি নেই। তোমার কাছে আমিই শেষ পর্যন্ত হেরে গেলাম নীলা। আমি আজ চলি।

নীলিমা : সে কি ! বন্ধু আসুক। নীলার কীর্তিকথা তাকে বলে যাও।

সমর : না।

নীলিমা : ও-মা সে কি ? হঠাৎ হতভাগী নীলার ওপর সমর চৌধুরীর এত দয়া যে !

সমর : নীলা তার বন্ধু অনিলাকে একখানা চিঠি লিখেছিল, সে-চিঠি আমি এতদিন পরে কাল দেখেছি।

নীলিমা : কেমন করে? কোথায়?

সমর : খামে মুড়ে অনিলা তাব নিজের চিঠি বলে আমাকে দেবার জন্যে দিয়েছিলো শিশিরকে।

নীলিমা : সমর! ছি ছি, তোমার কাছে আমি ধরা পড়ে গেলাম। হেরে গেলাম এতদিনে। অনিলা আমাকে এ কি লজ্জায় ফেললে।

সমব : আমি আসি এবার।

নীলিমা : হ্যাঁ এসো। তোমার সামনে আমি আর দাড়াতে পারছি না। তুমি এসো। যাবার সময় বলে যাও—

সমর : কি বলে যাব?

নীলিমা : তোমার নীলাকে তুমি ক্ষমা করলে।

সমর : সে কথা আমার নীলা জানে। মিসেস নীলিমা সেনকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পারবে।

নীলিমা : আব কোনদিন এখানে আসবে না বোধহয়।

সমর : বন্ধুপত্নী নীলিমা দেবীব নিমন্ত্রণ পেলেই আবার আসবো। নীলা আমার সঙ্গেই রইলো।

নীলিমা : খব ভাল একটি মেয়ে আছে। আমার বন্ধু। তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো। তাকে একদিন এখানে এনে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। আসবে তো?

সমর : এ কথার জবাব এখন দিতে পাববো না।

নীলিমা : এখন না দাও, তখন দিও।

(ঘরে ঢুকল শিশির)

শিশিব : একি সমর, চললে নাকি?

সমর : হ্যাঁ ভাই, চললাম।

শিশির : নীলিমাকে ক্ষমা করে যাচ্ছ তো?

সমর : ছি ছি শিশির, একি বলছো তুমি?

শিশির : বেশ, আমার নীলিমাকে ক্ষমা করতে না পারো তোমার নীলাকে ক্ষমা কোরো।

সমর : শিশির! তুমি—তুমি কি করে'—

শিশির ঃ জানি—সব জানি। চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভ্রমর ঃ চলো।

(দুই বন্ধুতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। গাড়ীতে গিয়ে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিলে। নীলিমা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে।)

ভাগ্য আমার ভালই বলতে হবে।

কলকাতা সহরে একখানা বাড়ী পেয়ে গেলাম। দু'খানি ঘর, রান্নাঘর—না, রান্নাঘর ঠিক বলা যায় না, রান্না করবার একটুখানি জায়গা। তা হোক, তাই বা পায় কে? ভাড়া মাত্র চল্লিশ টাকা। পাড়াটিও মন্দ নয়।

মাসের শেষে মাইনে পাই আশি টাকা। চল্লিশ টাকা যাবে বাড়ীর ভাড়া। বাকি থাকবে চল্লিশ। আমরা দু'জন মাত্র মানুষ। গৃহিনী আর আমি। তাইতেই চালাতে হবে কোনোরকমে। মেয়ে একটি ছিল। বছর-চারেক হ'লো মারা গেছে। বেঁচে গেছে। নিজেও বেঁচেছে আমাদেরও বাঁচিয়েছে। বেঁচে থাকলে আজ তেরো বছরের হ'তো। বিয়ে দেবার হাঙ্গামা ছিল।

স্ত্রীর কাছে এ-সব কথা বলবার উপায় নেই। কেঁদে ভাসিয়ে দেবে।

যে পাড়ায় ছিলাম, মস্ত বড়লোকের পাড়া। কেউ কারও খবর রাখে না। কেউ কাউকে চেনে না। ছিলাম একটা মস্ত বড় বাড়ীর নীচের একখানা অন্ধকার ঘরে। ভাড়া ছিল পঁচিশ টাকা। কিন্তু স্ত্রী বলতো, এখান থেকে আমাকে নিয়ে চল। এখানে থাকলে আমি মরে' যাব।

ঘরটায় না-ছিল আলো, না-ছিল হাওয়া।

প্রথমে ভেবেছিলাম, বলছে হয়তো—স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবার ভয়ে। আলো-হাওয়ার অভাবে।

পরে জানলাম, তা নয়।

স্ত্রী যেতে চাচ্ছেন—আলো-হাওয়ার অভাবে নয়, কথা কইবার লোকের অভাবে।

তা এখানে এসে কথা কইবার লোক তিনি পেয়েছেন।

পাশের বাড়ীর গিন্নিটি তাঁরই সমবয়সী। তার ওপর দু'বাড়ীর দুটি জানলা একেবারে মুখোমুখি। ছোট জানলা নয়, দুটিই বড়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

কথা বলতে হয় না। জানালার কপাট দুটি খুলে দিয়ে পান-দোক্তা নিয়ে বসে পড়লেই হ'লো।

এ রং যদি-বা একটি মেয়ে ছিল, মারা গেছে ; ওঁর আবার তাও নেই। ঝাড়া হাত-পা, একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট !

কান্নাকাটির পালা গেছে চুকে। তিনদিন পরেই দেখি—'আপনি'র পালা 'তুমি'তে এসে নেমেছে।

মেয়েটির নাম মায়া।

তাদের কথাবার্ত্তা সেদিন শুনতে পাচ্ছি সবই। দেখতেও পাচ্ছিলাম।

হঠাৎ দেখি, আমার বৌ-এর নজর পড়েছে মায়াব হাতের দিকে। হাতটা টেনে নিয়ে চুড়িগুলো তার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, তোমার এ চুড়ি কি ভাই নতুন ? কতদিন গড়িয়েছো ?

মায়া বললে, না, নতুন ঠিক নয়। তবে ভাল কারিগরের হাতের তৈরী কিনা ! দেখতে ঠিক নতুনের মতই আছে। তোমার হাতে চুড়ি নেই কেন ভাই ?

এই রে ! কান পেতে রইলাম। আমার স্ত্রী কি বলে শুনতে হবে।

আপাততঃ আমার কাজকর্ম্ম কিছু নেই। টাকার বড় টানাটানি। কাজেই বুঝতেই পারছেন, আমার স্ত্রীর হাতে চুড়ি না থাকার জন্য দায়ী আমি। চুড়িগুলি বন্ধক দিয়েছি এক স্যাকরার দোকানে।

শুনলাম আমার স্ত্রী বললে, চুড়ি আমার ছিল ভাই পুরনো প্যাটার্ণের। তাই সেগুলো ভাঙ্গিয়ে আবার নতুন করে' গড়তে দিয়েছি।

মায়া বললে, ঠিক এই আমার মতো গড়িয়ো ভাই। আমার দেখাদেখি অনেকে গড়িয়েছে।

জবাবে গৃহিনী কি যে বললে শুনতে পেলাম না।

গয়নার কথা আর কত শুনবো ? বেরিয়ে গেলাম বাড়ী থেকে।

পরের দিন দেখি আবার—

আবার আরম্ভ হয়েছে তাদের ঐশ্বর্যের কাহিনী।

আমার স্ত্রীই বলছে।

বলছে, আমার বাবা আমাকে কত টাকার গয়না দিয়েছিল জানো ভাই ? সে-সব গয়না দেখলে মুণ্ডু তোমার ঘুরে যেতো। পাঁচ হাজার টাকার গয়না— আগেকার দিনের পাঁচ হাজার টাকা এই, এ—তো !

মায়া জিজ্ঞাসা করলে, কি হ'লো সে সব গয়না ?

আমার স্ত্রী বললে, সব চুরি হয়ে গেছে।

মায়া বললে, চুরির কথাই যদি বললে তো শোনো! আমরা যখন বেলেঘাটায় ছিলাম, তখন আমারও ঠিক তাই! সব গেল চুরি হয়ে। এই এত টাকা, এত এত গয়না! আমাদের মেরে দিয়ে যায়নি এই যথেষ্ট! এই চুড়ি তারপরে গড়ালাম।

আমার স্ত্রী এইবার স্থরু করলে তার ফিরিস্তি।—বললে, আমার ছিল দু' সেট চুড়ি, বালা একজোড়া, রতনচূড় একজোড়া, অনন্ত আড়াই প্যাচ, ব্রেসলেট্ আর তাবিজ। আর সে সব গয়না কি! কোনোটা দশ ভরি কোনোটা পনেরো ভরি!

মায়াই বা ছাড়বে কেন? বললে, আমার বাবা বড়লোক্ না হ'লেও দিয়েছিল অনেক। কতক নিয়ে গেল চোরে, আর কতক গেল এমনিও। তা যাক্‌গে ভাই, কি আর করবো। উনি বলছেন আসছে মাসে দেবেন এক ছড়া মফ্‌চেন্ গড়িয়ে!

বলেই সে কি কাজের জন্য চলে গেল সেখান থেকে। বললে, আসছি।

আমার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম পাশের ঘর থেকে। আমাকে ডাকচে।—ওগো শুনছো? এই ঘরে এসো একবার। শুনে যাও।

গেলাম। বললাম. কি বলছো?

-বলছি আমার মাথা আর মুণ্ডু! চুড়িগুলো আমার কবে এনে দেবে বল।

বললাম, যত শীগ গির পারি। চেষ্টা করছি—এই মাসের ভেতর—

কথাটা শুনবামাত্র সে যেন দপ্ করে' জ্বলে উঠলো।—চেষ্টা করছি? চেষ্টা করছি বলতে একটু লজ্জা হলো না? লোককে বললাম, ভাঙ্গিয়ে গড়তে দিয়েছি। এখন যদি বল চেষ্টা করছি, তাহ'লে আমাকে মরতে হবে গলায় দড়ি দিয়ে। লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবো না।

বললাম, সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখো।

স্ত্রী বললে, ভেবে দেখবো? অবস্থাটা তোমার কখন ভাল হ'লো শুনি? আজ চোদ্দ বছর বিয়ে হয়েছে, ভাল অবস্থা তোমার তো আমি কখনও দেখলাম না।

কথাটা মিথ্যা নয়। অবস্থা ভাল আর বুঝি হয় না! চেষ্টাও তো কম

করি না। কিন্তু হয় কই? বিয়ের সময় সোনার গয়না তার বাবা দিয়েছিলেন কিছু। পাঁচ হাজার টাকা তার দাম ছিল কিনা জানি না। তবে এইটুকু শুধু জানি, কোনোদিকে কোনও পথ খুঁজে পাইনি, তখন একটি একটি করে' তার গায়ের গয়না বন্ধক দিয়েছি, প্রতিবারই ভেবেছি, টাকা হাতে এলেই ছাড়িয়ে দেবো কিন্তু কোনোবারই ছাড়াতে পারিনি। সুদে-আসলে টাকার অঙ্কটা ভারি হয়ে হয়ে শেষে গয়নাটাও গেছে হাতছাড়া হয়ে।

শেষ-সম্বল মাত্র ঐ ক'গাছা চুড়ি!

তাড়াতাড়ি এনে দিতে না পারলে তার লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক।

দু'জনের ঘনিষ্ঠতা বেড়েই চললো।

রান্না-খাওয়ার সময় ছাড়া দেখতে পাই দিনের প্রায় অধিকাংশ সময় তারা বসে আছে মুখোমুখি হয়ে। পান খাচ্ছে, জরদা খাচ্ছে আর গল্প করছে। গল্পের বিষয়বস্তু কিন্তু সব সময়েই এক। গয়না আর গয়না! এ-ছাড়া আলোচনার যোগ্য আর কোন কথাই যেন পৃথিবীতে নেই!

আসাম আর বিহারের বন্যার খবর ছাপা হয়েছে কাগজে। মায়ার স্বামী একখানা খবরের কাগজ কিনে এনেছে। মায়া সেই কাগজখানা পড়তে পড়তে ডাকলে আমার স্ত্রীকে।—শুনেছো অচলা, কি রকম বন্যার খবর বেরিয়েছে! হাজার হাজার বাড়ীঘর ভেসে গেছে, কত লোক মরেছে, কত লোক পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু বন্যার এই ভয়াবহ দুঃসংবাদও যে তাদের কাছে অন্য মূর্তিতে দেখা দেবে তা' আমার জানা ছিল না।

আমার স্ত্রী বললে, কত মেয়ের গায়ে কত গয়না তো ছিল ভাই! গয়না পরেই তো তারা ডুবে মরেছে।

মায়া বললে, হ্যাঁ তা' মরেছে। তবে কেউ কি ভেবেছো সে-সব খুলে নেবে না? নিশ্চয়ই নেবে। সোনার গয়না, পেতলের তো নয়।

অচলা বললে, আচ্ছা ভাই, ধরো গয়না গায়ে দিয়েই সব তো তখন ঘুমোচ্ছিল! কেউ কিছু জানতে পারলে না, ঘুমন্ত অবস্থাতেই নদী-বানে নিয়ে গেল ভাসিয়ে। তারপর ভাসতে ভাসতে কোথাও না কোথাও গিয়ে লাগবে ঠিক। বাস, যে দেখতে পাবে সেই খুলে নেবে। যে যা পারে বাগিয়ে নেবে না কি বল?

মায়া বললে, হ্যাঁ তা নেবে। এই গয়না পেয়ে কত লোক বড়লোক হয়ে যাবে দেখো।

অচলাকে বললাম, গয়না ছাড়া তোমরা কি আর কিছুই দেখতে পাও না? এ ছাড়া আর কি কোনও কথা নেই?

অচলা জবাব দিলে, গয়নার কথা না বললেই তুমি বাঁচো, না? বেশ আর বলবো না।

বলবো না কথাটা মুখেই একবার বললে শুধু। কথা সে রাখতে পারলে না।

পরের দিনই আবার সুরু হলো, আমার গয়না এনে দাও!

জীবন আমার অতিষ্ঠ করে' তুলেছে। কেন যে মরতে এ পাড়ায় এলাম জানি না। কথা বলার সঙ্গিনীও জুটলো ভালো।

তবে আমার স্ত্রীর চেয়ে মায়া মেয়েটি অনেক ভাল। গয়নার কথাটা আমার স্ত্রী যখন তোলে, তখন সে তাতে সায় না দিয়ে পারে না। কিন্তু তার যা আছে তাই নিয়েই সে খুশী। স্বামীর অবস্থা সে বোঝে।

অচলাকে তার বন্ধুর কথা বললাম।

—কই, তোমার বন্ধুটি তো তার স্বামীকে তোমার মত অতিষ্ঠ করে তোলে না?

অচলা বললে, কেন করবে? তার স্বামী তো তোমার মত সব উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেয়নি। নিজে বরং নতুন করে' গড়িয়ে দিয়েছে। ও কেন বলবে?

মায়ার স্বামীটি বড় ভাল মানুষ। রোজ দেখি, সকাল বেলা খেয়ে-দেয়ে জামা জুতো পরে আপিসে বেরিয়ে যায়। যাবার সময় হাত দুটি জোড় করে' কপালে ঠেকিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেবতাদের প্রণাম করতে করতে পথ চলে।

সন্ধ্যায় ফিরে আসে আপিস থেকে।

আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ায়। হেসে হেসে বলে, ভাল আছেন?

ঘাড় নেড়ে বলি, হ্যাঁ, ভাল আছি। মনে মনে বলি, খুব ভাল আছি।

ভদ্রলোকের মুখের হাসি দেখেই বুঝতে পারি, তিনি বেশ আনন্দেই আছেন। মনের মত স্ত্রী পেয়েছেন। আমার মত অবস্থা হ'লে বুঝতেন মজা! মুখের হাসি জন্মের মত শুকিয়ে যেতো।

স্ত্রীর চুড়ি আমি এখনও আনতে পারিনি। টাকা যা রোজগার করি, সবই খরচ হয়ে যায়। উদ্‌বৃত্ত কিছুই থাকে না। দিবারাত্রি মনের ভেতর কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছি।

সেদিন হঠাৎ শুনলাম, পাড়ার একটা বাড়ীতে খুব গোলমাল চলছে। কিসের গোলমাল জানবার বিশেষ আগ্রহও ছিল না। কলকাতা শহর। এমন কত বাড়ীতে কত গোলমাল বারোমাস লেগেই থাকে।

শেষে শুনলাম নাকি ওই বাড়ীতে একটি মেয়ে থাকে। নাম সাবিত্রী। তার বিয়ে। আগামী কাল।

সাবিত্রীকে চিনতাম না। চেনবার কোনও প্রয়োজনও ছিল না। কোনও হেতুও ছিল না।

তবু চিনতে হ'লো।

অচলা বললে' শুনেছো? সাবিত্রীর বিয়ে।

বললাম,তা বেশ তো। সাবিত্রীর বিয়ে তো তোমার কি?

—বা-রে, বর দেখতে যাব না?

—বর আব কি দেখবে? বিনা নিমন্ত্রণে যাওয়া কি তোমার উচিত হবে?

—তাহ'লে তোমার খুব ভাল হয়। না? চুড়িগুলো আনতে বলি না।—চুড়ি আমার এনে দাও, আমি বর দেখতে যাব।

বললাম, এখন আমি চুড়ি কেমন করে' আনবো বলতে পারো?

বললে, যেমন করে পারো, এনে দাও।

বিপদ মন্দ নয়। কারও কাছে যে কিছু ধার পাব—তারও উপায় নেই। ধার কেউ দেবে না। যারা দেবার মানুষ, তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার পথ রাখিনি। ধার নিয়েছি, কিন্তু পরিশোধ করিনি। স্পষ্ট সত্য কথা বলে বললাম, চুড়ি আমি এনে দিতে পারবো না।

আমার এই রূঢ় বাক্য তাকে বড় নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করলো। মুখখানি তার ম্লান হয়ে গেল দেখলাম। বললে, আনতে তাহ'লে পারবে না?

আবার বললাম, না। কি করবো বল। টাকা পাবার কোনও উপায় নেই। আর নাই-বা হ'লো চুড়ি! তোমার ওই কাঁচের চুড়ি-পরা হাত—বেশ লাগে দেখতে।

অচলা চীৎকার করে উঠল: থামো!

এত জোরে চীৎকার করতে তাকে আমি কখনও শুনিনি। এরকম মুখের চেহারাও আমি কখনও দেখিনি।

অপরাধীর মত আমি চুপ করেই ছিলাম। দেখলাম, অচলার দু'চোখ জলে ভরে এসেছে আর আপন-মনেই কি যেন বলছে বিড় বিড় করে'।

জিজ্ঞাসা করলাম. কি বলছো ?

অচলা বললে, বলছি হয় আমি মরি, নয় তুমি মর।

সর্ব্বনাশ! তার মুখে এরকম কথা এই প্রথম শুনলাম।

বললাম, আমি মরলে তুমি সুখী. হও ?

অচলা বললে, তাহ'লে আমাকে আর গয়না পরতে হয় না। খালি হাত দেখলে কেউ কিছু বলেও না।

অচলা থামলো না। মনের দুঃখে অনেক কথাই বলতে লাগলো।—ছেলে-পুলে নেই, একটা মাত্র মেয়েছেলের সাধ-আহ্লাদ মেটাবার ক্ষমতা যার নেই, সে মানুষ বিয়ে করে কেন ?

খুব সত্যি কথা। এ-কথার জবাব দেওয়া শক্ত। কাজেই চুপ করে' শোনা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

এইসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ যেন তার দুঃখ প্রকাশের মাত্রা বেড়ে গেল। কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো, আমি যে বললাম নতুন করে' গড়তে দিয়েছি তাব কি হবে ? কেন মবতে মিছে কথা আমি বলতে গেলাম !

এতক্ষণ পরে যেন কথা খুঁজে পেলাম। বললাম, মিথ্যা যে বলে তাকে শাস্তি একটুখানি পেতেই হয়।

অচলার কান্না যেন আরও বেড়ে গেল। বললে, কার সম্মান রাখবার জন্য আমি মিথ্যা বলেছি সেটুকু বুঝবার ক্ষমতাও যার নেই, সে কি মানুষ ?

রাত্রিকাল। দিনের চেয়ে রাত্রের শব্দ অনেক দূর থেকে শোনা যায়। বললাম, চীৎকার কোরো না অচলা, পাড়ার লোক শুনতে পাবে।

অচলা বললে, শুনুক। শুনিয়ে শুনিয়েই তো বলছি।

তবে তোমার যা খুশী কর—আমি চললাম।

বলে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ভেবেছিলাম পথে পথে খানিকটা ঘুরে আসি। কিন্তু এমনি অদৃষ্টের বিড়ম্বনা, সুমুখের বাড়ীর রকের দিকে নজর পড়তেই দেখলাম, পাশের বাড়ীর মায়ার স্বামী বসে আছে। আমাকে দেখেই বললে, আসুন, আসুন দাদা।

মুখে তার বিনয়নম্র হাসি।

তা তুমি কেন হাসবে না বল!

আমার মুখের হাসি তখন শুকিয়ে গেছে। কি আর করি, তারি পাশে গিয়ে বসে পড়লুম।

সাবিত্রীর বিয়ের গোলমাল তখনও চলেছে।

বললাম, বিয়ে বাড়ীর গোলমাল, না?

ভদ্রলোক বললে, আর বলেন কেন দাদা! ওদের বাড়ী বিয়ে, আর আমার হয়েছে মরণ।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

সে বললে, বাড়ীতে তিষ্ঠোতে পারছি না দাদা, তাই তো এই রকে এসে ব'সছি।

তার মুখের পানে তাকালাম। পথের ধারের গ্যাসের আলো এসে পড়েছিল তার মুখে। তার মুখেও বিষাদের ছায়া। বললে, মাফচেন্ মাফচেন্ ক'রে' ক্ষেপিয়ে খেলে দাদা, তবে আর বলছি কেন? কি কুক্ষণেই যে গয়নাটা বন্ধক দিয়েছিলাম কে জানে। বন্ধক যে কেন দিই তা' কি আর বুঝবে কেউ? যা রোজগার করি, তাতে আমাদের দুটো মাত্র লোক, তাও চালাতে পারি না। যাক, আপনি ও সব বুঝবেন না দাদা, আপনি ভালই আছেন। ভগবান করুন, ভালই যেন থাকেন। এ সব যেন কোনদিন বুঝতে না হয়।

বলে সে তার হাত দুটি জোড় ক'রে' কপালে ঠেকিয়ে ভগবানের কাছে তার প্রার্থনা জানালে।

এতক্ষণ পরে আমি যেন একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।